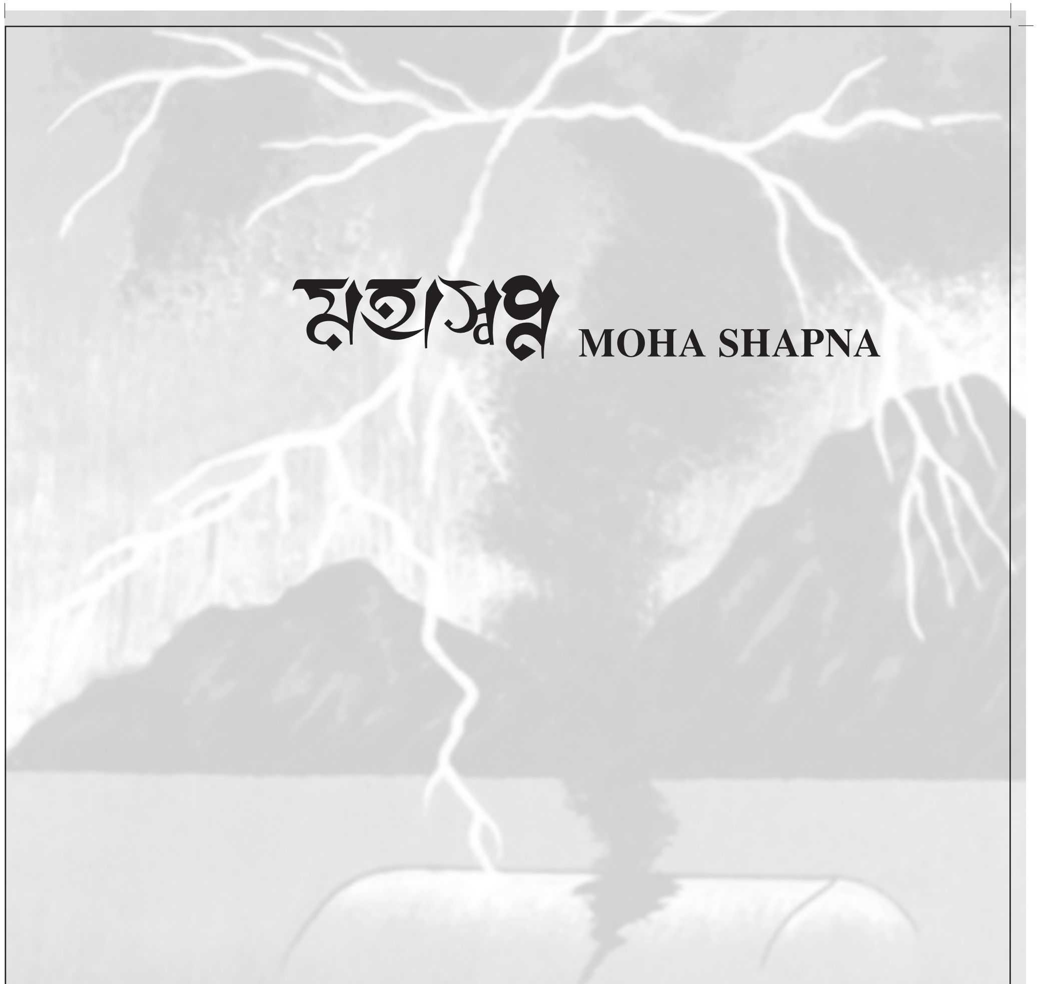
মহাস্বপ্ন MOHA SHAPNA



কুতুব-উল-আকতাব

অধ্যাপক (অবঃ) আলহাজ্জ্ব হযরত মাওলানা

মুহাম্মদ আয্হারুল ইসলাম সিদ্দিকী সাহেব (রহঃ)

বি, এ, (অনার্স); এম, এ; এফ, এম; এল, এল, বি; (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)

সিদ্দিকীয়া ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সিদ্দিক নগর, মানিকগঞ্জ দরবার শরীফ

প্রকাশক
মোর্শেদ কেবলার বড় সাহেবজাদা ও প্রধান খলিফা আলহাজ্জ হযরত মাওলানা
ড. মুহাম্মদ মনযুরুল ইসলাম সিদ্দিকী
বি.এ.(অনার্স); এম.এ; এম.এম; এল.এল.বি; (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)
পীর সাহেব, মানিকগঞ্জ দরবার শরীফ
প্রিন্সিপাল, জামি'আ-আরাবিয়া সিদ্দিকীয়া দারুল উলুম মাদ্রাসা
চেয়ারম্যান, সিদ্দিকীয়া ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

MOHA SHAPNA
Written by the great muslim scientist & religious leader of Bangladesh
Prof. Alhajj Hazrat Maulana Muhammad Azharul Islam Siddiquee (Rh.)
Peer Saheb, Manikgonj Darbar Sharif

Published by
Alhajj Hazrat Maulana D. Muhammad Manzurul Islam Siddiquee
Peer Saheb, Manikganj Darbar Sharif
Principal, Zamia Arabia Siddiquea Darul Ulam Madrasa (Siddique Nagar, Manikgonj)
Chairman, Siddiquea Foundation Bangladesh

১ম প্রকাশ	ঃ	১৪০৭ হিজরী,১৯৮৬ ইংরেজী
দশম সংস্করণ	ঃ	১৪২৫ হিজরী,২০০৪ ইংরেজী
প্রচ্ছদ	ঃ	গ্রন্থকার
গ্রাফিকস্ ডিজাইন	ঃ	কম্পিউটার প্রকৌশলী মুহাম্মদ রিয়াজুল হক
অক্ষর সংযোজন	ঃ	সিদ্দিকীয়া ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা
মুদ্রণে	ঃ	জেনিসিস প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং ৭৩, সিদ্ধেশ্বরী রোড, রমনা, ঢাকা, E-mail: genesisl@bdcom.com
মূল্য	:	পেপার ব্যাক টাকা ৪০/-, বোর্ড বাঁধাই ৬০/-
Price	:	Paper Back Indian Rs. 40/-, Board Binding 60/- Europe 4 Euro, US $ 4

ISBN-984-32-1183-9

ভূমিকা

অনেকের ধারনা মানুষ মরার পর শেষ হয়ে যায়। মুসলমানরা, খৃষ্টানরা কবরে মানুষকে গলিয়ে দেয়। হিন্দুরা পুড়িয়ে দেয়। তাহলে, কবরের আযাব কেমন করে হয়? আবার অনেকে বলেন, বিমান দুর্ঘটনায় মানুষ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়, তার তো কবরই হয় না অথবা মরনের পরে জীব জন্তুতে খায় অথবা পানিতে পঁচে যায়- এসব ক্ষেত্রে কবরের আযাবের ধারণা একটা ভ্রান্ত কথা। এসব এবং আরও প্রশ্নের জবাব বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে এই বইটিতে দেয়া হয়েছে। একটি কথা না বলে পারছিনা, আজ প্রায় দেড় হাজার বছর যাবত বিভিন্ন ইসলামী চিন্তাবিদগণ ও মুসলিম বৈজ্ঞানিকগণ কবরের আযাবের বা শাস্তির শুধু আত্মিক ব্যাখ্যাই দিয়েছেন কিন্তু বইটিতে হাদিস শরীফে যে দৈহিক শাস্তি বা স্বস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেভাবেই বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে প্রমাণ করে সম্পূর্ণ নতুন একটি থিওরী (Man will have never been vanishing, and one man divided into crore of crores **atom-men** after death and they can listen and watch with live feelings.) "মৃত্যুর পর মানুষ নিঃশেষ হয়ে যায় না, একটি মানুষ কোটি কোটি **পরমাণু মানুষে** রূপান্তরিত হয় এবং তারা অনুভূতি নিয়েই শুনতে ও দেখতে পায়" আবিষ্কার করা হয়েছে। হাদিস শরীফে আছে, কবরে সাপে কামড়াবে। এ হাদিস শরীফের ব্যাখ্যায় এ যাবত শুধু আত্মিক কামড়রে কথাই বলা হয়েছে কিন্তু কবরে নিশ্চিহ্ন মানুষের দৈহিক শাস্তি যে সম্ভব তা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে প্রমাণ করা আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার লক্ষ্য।

এ অতি নগণ্য প্রচেষ্টাকে একটি মানুষ যদি ক্ষমাভরা দৃষ্টিতে দেখে একটু আনন্দ পান তবে শ্রম সার্থক মনে করব।

লেখক

প্রকাশকের কথা

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, দার্শনিক, গবেষক, অন্যতম মুসলিম বিজ্ঞানী ও আধ্যাত্মিক মহাসাধক, গাউস-উল-আজম, কুতুব-উল-আকতাব, পীরে কামেল ও মোকাম্মেল, অধ্যাপক (অবঃ) আলহাজ্ব হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আয্হারুল ইসলাম সিদ্দিকী সাহেব (রহঃ) বি.এ. (অনার্স), এম.এ, এফ.এম; এল.এল.বি, (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) কর্তৃক রচিত "মহাস্বপ্ন" নামক গবেষণামূলক বিজ্ঞানভিত্তিক মহাপুস্তক খানি প্রকাশনার দায়িত্ব আমার উপর অর্পিত হয়েছে – আলহামদুলিল্লাহ্।

জীবন সংগ্রামের বন্ধুর পথে পাগলপারা মানুষেরা উদ্‌ভ্রান্তভাবে চলতে চলতে জাগতিক নিয়মের রিপুর তাড়নায় তাড়িত হয়ে হারিয়ে ফেলে পারলৌকিক জীবনের কুসুমাস্তীর্ণ পথ। আর নিমজ্জিত করে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় জীবনকে কন্টকাকীর্ণ তিমিরাচ্ছন্ন দিগন্তে। বিশ্বের নতুন কোন আবিষ্কার বুঝতে মানুষের কিছু সময় লাগাটাই স্বাভাবিক, নিরলস গবেষণা আর অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমেই নতুন কিছু আবিষ্কার করা সম্ভব এবং এই আবিষ্কার বুঝতে হলেও অবশ্যই কিছু না কিছু গবেষণার প্রয়োজন। "মহাস্বপ্ন" নামক মহাকিতাবের মাধ্যমে ইতিহাসের পাতায় আরো একজন মুসলিম বিজ্ঞানীর নতুন একটি থিওরী আবিষ্কৃত হলো। যা অভাবনীয় ভাবে বিজ্ঞানের চলার পথকে প্রশস্ত করবে। এ থিওরীর ফলে হুজুরপাক (সাঃ) এর মহাজ্ঞানের বিশালতা সম্পর্কে মানবকুল আরো একবার শুকরিয়া আদায় করে বলবে আলহামদুলিল্লাহ্। ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় জীবনের সমৃদ্ধির স্বার্থে হাদিস শরীফের বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণ মানব জীবনের সহায়ক হলে লেখকের প্রচেষ্টা স্বার্থক হবে।

প্রকাশনার কাজে যারা সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেছেন প্রত্যেককে আমার আন্তরিক মুবারকবাদ। সবার জন্য দুনিয়া এবং আখেরাতের মঙ্গল কামনা করি।

প্রকাশনার ব্যাপারে অনিচ্ছাস্বত্ত্বেও কিছু কিছু ভূল ত্রুটি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক, সুধী পাঠকমহল তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এটা একান্তভাবে কাম্য।

প্রকাশক

সূচী পত্র

লেখক পরিচিতি

জন্ম ও বংশ পরিচয়

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, দার্শনিক, গবেষক, অন্যতম মুসলিম বিজ্ঞানী ও আধ্যাত্মিক মহাসাধক, মোজাদ্দেদে মিল্লাত, পীরে মোকাম্মেল, গাউস-উল-আজম, কুতুব-উল-আকতাব, অধ্যাপক (অবঃ) আলহাজ্ব হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আয্‌হারুল ইসলাম সিদ্দিকী সাহেব (রহঃ) ১৯৩৭ সালে মানিকগঞ্জ জেলার অন্তর্গত ঘিওর থানার তেরশ্রীর পয়লা গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম ও শিক্ষিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ও মাতা উভয়ই সম্ভ্রান্ত সৈয়দ বংশীয় ছিলেন। তাঁর পিতার নাম আলহাজ্ব অধ্যাপক হযরত মাওলানা সৈয়দ মোঃ নছিমুজ্জামান সিদ্দিকী সাহেব (রহঃ), যিনি তেরশ্রী কলেজের একজন অত্যন্ত উচ্চজ্ঞানসম্পন্ন আদর্শ শিক্ষক ও হাক্কানী আলেম ছিলেন, তিনি উর্দূ কবি হিসাবে খ্যাত ছিলেন। মোর্শেদ কেবলার মাতার নাম সৈয়দা মালেকা সিদ্দিকা (রহঃ) তিনি ইসলামী জীবন ব্যবস্থার আদর্শ অনুসারী ও একজন পরহেজগার তাপসী ছিলেন। মোর্শেদ কেবলার দাদাজান ডাঃ সৈয়দ আব্দুল জব্বার সিদ্দিকী সাহেব (রহঃ) তৎকালীন একজন খ্যাতনামা বিলেত ফেরত সার্জন ও ইসলামী চিন্তাবিদ ছিলেন। তিনি ফারসী ভাষার উচ্চ স্তরের কবি ছিলেন।

শিক্ষা ও কর্ম জীবন

ছেলেবেলা থেকেই তিনি অত্যন্ত প্রখর স্মরণ-শক্তি সম্পন্ন মেধাবী ছাত্র ছিলেন। যার ফলে শ্রদ্ধেয় শিক্ষকমন্ডলী খুব যত্ন সহকারে তাঁকে পাঠদান করাতেন। তিনি ১৯৫১ সালে ফাযেল পরীক্ষায় বোর্ডষ্ট্যান্ড করেছেন। উল্লেখ্য যে, তখন সমগ্র পাকিস্তানে মাত্র ৪৭ জন প্রথম বিভাগ পেয়েছিলেন। এই মহান আল্লাহ্‌র ওলী ইসলামী শরীয়তের বিষয়াদি অধ্যায়নের পাশাপাশি জেনারেল বিষয়াদিও অধ্যায়ন করতেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতি বিষয়ে সম্মানের সহিত বি.এ. (অনার্স) ও এম.এ. ডিগ্রী অর্জন করেন। পাশাপাশি এল.এল.বি ডিগ্রী লাভ করে তিনি ঢাকা হাইকোর্টে ওকালতি পেশায় মনোযোগ দেন। মানবিক বিভাগের মেধাবী ছাত্র হলেও তিনি বিজ্ঞান ও আরবী বিভাগের জ্ঞানার্জনে বেশী আগ্রহী ছিলেন। যার ফলে আল্লাহ্‌পাকের মেহেরবানীতে জে্যাতিশাস্ত্র (Astronomy), দর্শণ (Philosophy), দেহবিজ্ঞান (Physiology), মনোবিজ্ঞান (Psychology), ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা (Anatomy), পদার্থবিদ্যা (Physics), রসায়ন (Chemistry) ইত্যাদি বিষয়ে উক্ত বিভাগের ছাত্রদের তুলনায় অধিক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। বলাবাহুল্য তিনি আরবী ভাষায় মহাপান্ডিত্য অর্জন করেন, যার ফলশ্রুতিতে

দেশ বিদেশের বহু বরেণ্য আলেম ওলামাগণ নিজ নিজ অর্জিত এলেমকে আমলে পরিণত করার জন্য তালিম ও তাল্কিন নিতে তাঁর নিকট ছুটে আসতেন।

তিনি বরাবরই শিক্ষকতাকে পছন্দ করতেন। পেশা হিসেবে তিনি শিক্ষকতাকে বেছে নিয়ে মানিকগঞ্জ দেবেন্দ্র মহাবিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে ১৬ বছর অধ্যাপনা করেন। তাঁর পড়ানোর পদ্ধতিটি এতই অভিনব ও মানসম্মত ছিল যে, যখন তিনি ক্লাসে পড়াতেন তখন অন্যান্য বিভাগের ছাত্ররা তাদের ক্লাস বাদ দিয়ে তাঁর ক্লাস করতে ছুটে আসতো। উল্লেখ্য যে, কোন ছাত্র কখনই বাসায় এসে ক্লাসে পড়ানো বিষয়ে প্রাইভেট পড়তে হয়নি। তবে তিনি ইংরেজী বিভাগের ছাত্রদেরকে প্রাইভেট পড়াতেন। পাশাপাশি তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সিনিয়র এক্জামিনার ছিলেন। তিনি সম্মিলিত পূর্ব-পশ্চিম পাকিস্তানের 'সাইকো এনালাইসিস এসোসিয়েশনের' জেনারেল সেক্রেটারী হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন।

আধ্যাত্মিক মহাসাধনা

অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের এই আধ্যাত্মিক মহাসাধক জন্মগত আল্লাহ্র ওলী ছিলেন। বড় বড় আল্লাহ্র ওলীগণ (কুতুব-উল-আকতাব) দুনিয়াতে আসার পূর্বে আল্লাহ্পাকের মহাসৃষ্টি জগতের সব কিছু ঐ আল্লাহ্র ওলীর জন্য সব সময় দোয়া করতে থাকেন এবং মহান আল্লাহ্পাক দয়াল নবীজী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মাধ্যমে পিতা-মাতা, ওস্তাদ অথবা সে সময়ের কোন আধ্যাত্মিক সাধককে অবগত করান। তিনি যখন মাতৃগর্ভে আসলেন তখন তাঁর পরম শ্রদ্ধেয়া মা স্বপ্নে দেখলেন "স্বয়ং দয়াল নবীজী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) হাসি মুখে এসে একটি সুন্দর লাল গোলাপ তার হাতে উপহার দিলেন এবং সাথে সাথে বেশ কিছু লাল আলো চতুর্দিকে ছড়াচ্ছিল এবং চারিদিক উজ্জ্বল হয়েছিল" (আলহামদুলিল্লাহ্)। হুজুরপাক (সাঃ) বলেছেন - "আমাকে যদি কেহ স্বপ্নে অথবা বাস্তবে দেখে তার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম"। শুধু স্বপ্নে দেখলেই জাহান্নামের আগুন হারাম আর হাসি মুখে ফুল দিলে কি হতে পারে-, সাধনা'রত মোকাম্মেল পীরের জ্ঞানী ভক্তবৃন্দ তা সহজেই অনুধাবন করতে পারেন। যে বিছানায় শিশু মোর্শেদ কেবলা ঘুমাতেন সেই বিছানার পাশের জানালা দিয়ে রোদ এসে বিছানায় পরতো, কিন্তু একটি সাপ এসে জানালায় এমন ভাবে পেচিয়ে ফনা ধরে ছিল, যাতে আল্লাহ্র অলীর গায়ে রোদ না লাগে (আলহামদুলিল্লাহ্)। এ ঘটনা দেখে তাঁর পিতা বললেন, "ছেলে হিসেবে খোদা আমাকে একটি রত্ন পাঠিয়েছেন, আমি দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ সুসংবাদ পেয়েছি যে, আমার এ ছেলের যমানায় ইসলামী দর্শনে ওর চেয়ে জ্ঞানী আর কেউ হবে না (আলহামদুলিল্লাহ্)"।

খুব ছোট বয়সেই তিনি নির্জনে একা বসে সৃষ্টিজগতের অপূর্ব এই মহাসৃষ্টির মহা

স্রষ্টাকে খুজতেন, আর অঝোরে চোখের পানি ঝরাতেন ও বলতেন কে আমাকে বানিয়েছেন আমাকে দেখা দেন। যখন তিনি সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র, তখন তিনি ভাবলেন আল্লাহ্পাককে পেতে হলে আরবী মাধ্যমে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, তাই তিনি ইংরেজী মাধ্যমের পাশাপাশি মাদ্রাসা বিভাগের পড়া শেষ করেন।

তিনি ১৯৫১ সালে হযরত মাওলানা মোঃ আব্দুল গণি সাহেব (রহঃ) (বনবাসী দরবেশ) এর নিকট বয়াত (মুরিদ) হন এবং ৯ বছর পাহাড়ে পাহাড়ে সাধনার পর হুজুর কর্তৃক কাদ্রীয়া তরীকার খেলাফত প্রাপ্ত হন এবং তাঁর নির্দেশেই চরমোনাইর মরহুম পীর সাহেব হুজুর আলহাজ্ব হযরত মাওলানা সৈয়দ মোঃ এসহাক সাহেব (রহঃ) শ্রদ্ধেয় দাদাহুজুর কেবলার (যিনি পানির উপর জায়নামাজ বিছিয়ে নামাজ পরতেন) নিকট বয়াত গ্রহণ করেন ও এলমে মা'রেফতের জগতে গভীরভাবে বিচরণ করেন এবং অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের আদব জ্ঞান সম্পন্ন এ মহান আল্লাহ্র ওলী তাঁর সঠিক সাধনার মাধ্যমে মাত্র ৩ বছরের মাথায় চিশতিয়া সাবেরিয়া তরিকার খেলাফত প্রাপ্ত হন এবং ১৩ বছর শ্রদ্ধেয় দাদাহুজুর কেব্লার নিকট সাধনা'রত ছিলেন। বরিশালের হুজুর কেবলা তাঁকে আদর করে "আয্হারুল ইসলাম ব্যারিস্টারসাব" নাম ধরে ডাকতেন এবং মাহ্ফিলে শ্রদ্ধেয় দাদাহুজুর কেব্লা মোর্শেদ কেবলাকে সকল মানুষের সামনে বলতেন "আয্হারুল ইসলাম ব্যারিস্টারসাব খাড়াও (দাঁড়াও) মানুষরে দেহাও (মানুষকে দেখা দাও), এই আয্হার আমার কলিজার টুকরা"। মোর্শেদ কেব্লা শ্রেষ্ঠ চিশতিয়া ও কাদ্রীয়া উভয় তরীকা থেকেই খেলাফত (সনদ) প্রাপ্ত হন।

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ শামসুল হক ফরিদপুরী সাহেব (রহঃ) (শায়েখ- জামে'আয়ে ফোরকানিয়া মাদ্রাসা, লালবাগ, ঢাকা) আলহাজ্ব হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আয্হারুল ইসলাম সিদ্দিকী সাহেব (রহঃ)-কে বলেছিলেন, "আমি আল্লাহ্পাকের নিকট দোয়া করেছি, মা'বুদ একজন ইংরেজী বাংলা শিক্ষিত জ্ঞানী মানুষকে আপনি এলমে শরীয়ত ও এলমে মা'রেফতের পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান দান করেন। আমার এ দোয়া আল্লাহ্ পাকের নিকট যে কবুল হয়েছে, তার প্রমাণ হচ্ছেন স্বয়ং আপনি। আল্লাহ্পাক আপনাকে এলমে শরীয়ত ও এলমে মা'রেফতের পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান দান করেছেন।" (আলহামদুলিল্লাহ্)

মানিকগঞ্জ দরবার শরীফ প্রতিষ্ঠা

১৯৬৫ সালে বরিশালের হুজুর কেবলা আলহাজ্ব হযরত মাওলানা সৈয়দ মোঃ এসহাক (রহঃ) এর হুকুম ও দোয়ার মাধ্যমে মানিকগঞ্জ দরবার শরীফ প্রতিষ্ঠা করেন ও সমগ্র বিশ্বে ইসলামের এলমে শরীয়ত ও এলমে মা'রেফতের আলো ছড়িয়ে দেয়ার অক্লান্ত পরিশ্রম শুরু করেন। মাইলের পর মাইল, কখনো পায়ে হেটে, কখনো সাইকেল চালিয়ে হুজুর কেবলা মাহ্‌ফিল করতে যেতেন এবং মানুষকে ইসলামের পথে আনতে লাগলেন। উল্লেখ্য যে, বরিশালের হুজুর কেবলা জীবিত থাকা অবস্থায় তিনি কখনোই নিজের নামে বয়াত (মুরিদ) করেননি, এটা তিনি আদবের খেলাফ মনে করতেন। সমাজে হাক্কানী আলেম তৈরীর লক্ষ্যে এই মহান আল্লাহ্‌র ওলী ১৯৭৭ সালে জামি'আ-আরাবিয়া সিদ্দিকীয়া দারুল উলুম মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। যেখানে আদব, এলমে শরিয়ত ও এলমে মা'রেফত ইত্যাদি বিষয়ের পাশাপাশি আরবী, উর্দু, বিজ্ঞান ও ইংরেজী বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ তালিম দেয়া হয়। আধ্যাত্মিক জগতের এই দিকপাল তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বের প্রায় এক কোটি ত্রিশ লক্ষ মানুষকে সঠিক ইসলামের পথে পরিচালিত করে মহান আল্লাহ্‌পাকের সাথে ভালবাসা স্থাপন করেছেন। মানিকগঞ্জ দরবার শরীফ হচ্ছে হুজুরপাক (সাঃ)-কে ভালবাসার এবং তাঁর সুন্নতকে সঠিকভাবে মানার দরবার শরীফ। তিনি প্রতি বছর অগ্রহায়ণ ও ফাল্গুন মাসে দুইবার বাৎসরিক ইসলামী মহা-সম্মেলনের আয়োজন করেন। যেখানে মাত্র তিন দিনে মানুষকে এলমে মা'রেফত ও এলমে শরীয়তের পূর্ণাঙ্গ দিক নির্দেশনার মাধ্যমে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা তথা হুজুরপাক (সাঃ) এর পূর্ণাঙ্গ সুন্নত পালনের জন্য পরিপূর্ণ শিক্ষা দান করা হয়। যেখানে দেশ বিদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ ও ভক্তবৃন্দ এলমে শরিয়ত ও এলমে মা'রেফতের তালিম নিতে এবং নবীপ্রেমে মশগুল হয়ে সুন্নতের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পাগলের মত ছুটে আসেন। এখানে পর্দা, আদব, আখলাক, এলেম থেকে শুরু করে তাসবিহ্‌, পাগড়ী, মেস্‌ওয়াক পর্যন্ত সকল সুন্নতের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা নেয়া হয়। দেশ-বিদেশ থেকে আগত বিভিন্ন আলেম-ওলামাগণ মন্তব্য করেছেন- "মানিকগঞ্জ দরবার শরীফ সুন্নত ও আদবের দরবার"। পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞানের উৎস হচ্ছে কোরআন শরীফ ও হাদিস শরীফ। তার বাস্তব প্রমাণ মানিকগঞ্জ দরবার শরীফে গেলে স্বচক্ষে অবলোকন করা যায়।

মানিকগঞ্জ দরবার শরীফে শিক্ষিত, জ্ঞানী ও আলেমের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশী। বর্তমানে মোর্শেদ কেবলার বড় সাহেবজাদা ও প্রধান খলিফা আলহাজ্ব হযরত মাওলানা ড. মুহাম্মদ মনযুরুল ইসলাম সিদ্দিকী সাহেব বি.এ.(অনার্স); এম.এ; এম.এম; এল.এল.বি; (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) পিতার নির্দেশ ও দোয়ার মাধ্যমে বাৎসরিক ইসলামী মহা-সম্মেলন ও মানিকগঞ্জ দরবার শরীফ অবিকল পিতার মতই পরিচালনা করছেন। বর্তমান পীর সাহেব কেবলা (আব্বা হুজুর) সম্পর্কে বাৎসরিক ইসলামী মহা-সম্মেলনে মোর্শেদ কেবলা বলেছিলেন "তোমাদের জন্য আমি দরদভরা একজন দরদী মনের মানুষকে রেখে গেলাম, আমি আমার আমলে যতটুকু ইসলামের প্রচার এবং প্রসার করেছি আমার আদরের ছেলে, আল্লাহ্‌র বান্দা তার আমলে এর চাইতে দশ গুন বেশী প্রচার এবং প্রসার করবে ইন্‌শাআল্লাহ্‌। বাপকা বেটা সিপাই কা ঘোড়া। ছেলে শক্তিশালী হলেই পিতা শক্তিশালী হয়। আমার এ ছেলে আল্লাহ্‌র বান্দা দুনিয়াতে আসার পূর্বে আমি চোখের পানি ফেলে আল্লাহ্‌পাকের নিকট দোয়া করেছিলাম মাবুদ আমাকে একটি ছেলে সন্তান দেন আমি এই সন্তানকে ইসলামের কাজের জন্য নিয়োজিত করবো, আল্লাহ্‌পাক আমার এ দোয়া কবুল করেছেন" (আলহামদুলিল্লাহ্‌)। যেই মহান আল্লাহ্‌র ওলী চোখের পলকে একজন জাহান্নামী মানুষকে আল্লাহ্‌র ওলী বানাতে পারতেন সেই মোর্শেদ কেবলা চোখের পানি ঝরিয়ে যাকে দুনিয়াতে এনেছেন সেই মানুষটি কেমন হতে পারে জ্ঞানী মানুষ খুব সহজেই তা বুঝাতে পারেন। আমরা সবাই যেন এই মহানেয়ামতের সঠিক কদর করতে পারি। উল্লেখ্য যে, মানিকগঞ্জ দরবার শরীফের সকল ভক্তবৃন্দ ধর্মীয় গোড়ামী, কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস থেকে সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ, কারণ মানিকগঞ্জ দরবার শরীফের পীর সাহেব হুজুর, একজন শিক্ষাবিদ হিসাবে শুধু বাংলাদেশেই নয়, সমগ্র বিশ্বে অন্যতম। পাক-ভারত উপমহাদেশে এত উচ্চ শিক্ষিত পীর নেই বললেই চলে। একজন খাঁটি আল্লাহ্‌র ওলি, জাইয়েদ আলেম ও একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদের সহ্‌বতে এসে মহান আল্লাহ্‌পাকের সান্নিধ্য অর্জনের লক্ষ্যে সকলে আমন্ত্রিত।

গবেষণা ও কিতাবসমূহ

যখন বিজ্ঞান চর্চার উপর না-জায়েযের ফতোয়া ছিল, চশমা ব্যবহারটাকেও জায়েয হবে না বলে মনে করা হতো, গোড়া আলেম ও ভন্ড পীরদের কারণে সমাজে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হচ্ছিল, ঠিক সে সময় তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিরলস গবেষণা করে যুগান্তকারী বিজ্ঞানভিত্তিক মহা কিতাবসমূহের মাধ্যমে সমাজ থেকে কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ও ধর্মীয় গোঁড়ামী বিদূরিত করেছিলেন। সেই মহা কিতাবসমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এখানে তুলে ধরা হলো।

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পর্দা

সমাজের নর-নারীকে নৈতিক অবক্ষয় থেকে রক্ষা করার জন্য ও চরিত্রবান আদর্শ নর-নারীর সুশৃংখল জীবন পরিচালনার দিক নির্দেশনা হিসাবে কোরআন শরীফ ও মনোবিজ্ঞানের আলোকে ১৯৭৪ সালে সমাজকে উপহার দিলেন "বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পর্দা" নামক মহাগ্রন্থটি এবং প্রমাণ করে দিয়েছেন পর্দা শুধু ধর্মীয় জীবন ব্যবস্থার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে সকল স্তরের মানুষের জন্য অপরিসীম

কল্যাণ বয়ে আনে। যার ফলে অসংখ্য নর-নারী বেপর্দা ও বিষাক্ত জীবন থেকে ফিরে এসে পর্দার মাধ্যমে শান্তিময় ইসলামী জীবন বেছে নিয়েছে। এমনকি এই কিতাব পড়ে অনেক হিন্দু ও খৃষ্টান মহিলারা পর্যন্ত পর্দা (বোরখা পরে) করা শুরু করেছে।

তারানায়ে জান্নাত

তিনি ১৯৮১ সালে "তারানায়ে জান্নাত" বা বেহেশ্‌তী সূর নামক অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের আধ্যাত্মিক গজলের কিতাব প্রকাশ করে মহাকবির পরিচয় দিয়েছেন। যা সালেককে আল্লাহ্‌পাকের খুব নিকটে পৌঁছায়। তারানায়ে জান্নাত স্মরণ করিয়ে দেয়, ৯৯৯ সালের দিকে "মহাকাব্য শাহনামার" লেখক মহাকবি ফেরদৌস সাহেব, আনুমানিক ১২০৫ সালের "গুলিস্তার" লেখক আল্লামা শেখ সা'দী সাহেব (রহঃ) এবং ১২৩৭ সালে "মসনবী শরীফের" লেখক মহাকবি মাওলানা জালালউদ্দিন রুমী সাহেব (রহঃ)-র মত মুসলিম মহাকবিদের অমর কীর্তির কথা।

মহাস্বপ্ন

হুজুরপাক (সাঃ) এর পর সুদীর্ঘ প্রায় ১৫ শত বছর পর তিনিই প্রথম তাঁর লিখিত "মহাস্বপ্ন" নামক কিতাবে একটি হাদিস শরীফের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ করেছেন যা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। সুদীর্ঘ্য দশ বছর নিরলস গবেষণা ও অক্লান্ত পরিশ্রম করে ১৯৮৬ সালে বিজ্ঞানকে উপহার দিলেন 'মহাস্বপ্ন' নামক বিজ্ঞানভিত্তিক মহাকিতাব। যা ইতিহাসে ইসলামের নাম উজ্জ্বল করে রাখবে।

এই কিতাবে তিনি বিজ্ঞানের এই উৎকর্ষের যুগে বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ নতুন একটি থিওরী (Man will have never been vanishing, and one man divided into crore of crores atom-men after death and they can listen and watch with live feelings)। "মৃত্যুর পর মানুষ নিঃশেষ হয়ে যায় না, একটি মানুষ কোটি কোটি **পরমাণু-মানুষে** রূপান্তরিত হয় এবং তারা অনুভূতি নিয়েই দেখতে ও শুনতে পায়" আবিষ্কার করে প্রমাণ করে দিয়েছেন ইসলামের মহা মনীষীদের মাধ্যমেই বিজ্ঞানের সূত্রপাত। এবং মনে করিয়ে দিয়েছেন ৭৬৮ সালে রসায়নের জনক জাবির ইবনে হাইয়ান সাহেবের কথা, যার লিখিত "আল-কিমিয়া" নামক মহাকিতাব থেকে পরবর্তীতে রসায়নের (Chemistry) জন্ম, তিনিই প্রথম সালফিউরিক এসিড, নাইট্রিক এসিড ইত্যাদি আবিষ্কার করেছিলেন। আল-বাত্তানী সেই ৮৯০ সালেই ত্রিকোণমিতির সাইন (SinA), কোসাইনের (CosA) সাথে ট্যানজেন্টের (TanA) সম্পর্ক আবিষ্কার করেছিলেন এবং সর্বপ্রথম ৩৬৫ দিন, ৫ ঘন্টা, ৪৬ মিনিট ২৪ সেকেন্ড = এক সৌর বছর প্রমাণ করে দিয়েছিলেন, এবং টলেমীর বহু থিওরী সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণ করে দিয়েছিলেন। আনুমানিক ১০১৫ সালের চিকিৎসা বিজ্ঞানের জনক আবু আলী ইবনে সিনায় লিখিত মহা-কিতাব "আল কানুন ফি আল টিব্ব" (যা ছিল ১৭৫০ সাল পর্যন্ত বিশ্বের সমস্ত দেশের চিকিৎসা বিজ্ঞানের পাঠ্য বই) এর ইসলামের মর্যাদাপূর্ণ বিজয়ের কথা। একজন নবীন বিজ্ঞানী ও গবেষক "মহাস্বপ্ন" নিয়ে গবেষণা করে বলেছেন "মহাস্বপ্ন" নামক মহাকিতাবটি প্রায় ৫০০ বছরের ভিতরে অন্যতম মুসলিম মহাবিজ্ঞানীর আবিষ্কার যা বিজ্ঞানের মত ধারাকে পরিবর্তন করবে। উল্লেখ্য ১৯৮৭ সালে এই মহাবিজ্ঞানী মোর্শেদ কেবলা বলেছিলেন "মানুষের আঙ্গুলের একটু অংশ কেটে ফেললে ঐ কাটা অংশ থেকে অসংখ্য মানুষ তৈরী করা সম্ভব"- যা পরবর্তীতে ক্লোন থিওরীর রূপ নিল এবং ডলি নামক ভেড়া তৈরী করা হল। মানুষ তৈরীর গবেষণা চলছে। "মহাস্বপ্ন" সম্পর্কে তিনি বলেছেন, আমার মহাস্বপ্ন নামক চটি বইখানা যদি ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ করা হয় তাহলে কয়েকটি ৫ টনি ট্রাক ভরা কিতাব হবে।

জীবন রহস্য ও দেহতত্ত্ব (A Philosophy of Physiology)

১৯৮৮ সালে তিনি "জীবন রহস্য ও দেহতত্ত্ব" (A Philosophy of Physiology) নামক কিতাবের মাধ্যমে জীব বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে ও দর্শনের যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন মহান আল্লাহ্‌পাক মানব দেহের ভিতরের নানা জটিল কার্য কিভাবে অনবরত সমাধান করছেন এবং দেহটাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। মেডিক্যাল সাইন্সের জিস্ট (নির্যাস) বের করে কোরআন শরীফের আলোকে এ কিতাবখানি লেখা হয়েছে। মানব দেহের কোথায় আল্লাহ্‌পাক থাকেন তার সঠিক প্রমাণ করা হয়েছে। অনেক নাস্তিক এ কিতাব পড়ে আল্লাহ্‌পাকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে বাধ্য হয়েছে এবং আল্লাহ্‌র পথে এসেছে।

মা'রেফতের ভেদতত্ত্ব

১৯৮৯ সালে "মা'রেফতের ভেদতত্ত্ব" নামক মা'রেফতের উচ্চাঙ্গের তথ্য ও দিক নির্দেশনা সম্বলিত কিতাব লিখেন, যা চিশতিয়া সাবেরিয়া তরীকার সালেকদের পাঠ্য বই হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

মহা ভাবনা (A Philosophy of Astronomy)

মহান আল্লাহ্‌পাকের অস্তিত্ব সম্পর্কে একমাত্র তিনিই প্রথম তাঁর লিখিত "মহা-ভাবনা" (A Philosophy of Astronomy) নামক মহাকিতাবে সমগ্র বিশ্বকে চ্যালেঞ্জ করেছেন, যা বিশ্বের নাস্তিকদের মাথা নিচু করে দিচ্ছে। কোরআন শরীফ, হাদীস শরীফ ও বিজ্ঞানের আলোকে আল্লাহ্‌পাকের বিশালতা সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করা হয়েছে এ কিতাবটিতে। এবং যুক্তি দিয়ে দেখানো হয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌পাকের এবাদত করে না সে নিকৃষ্ট প্রাণীর চেয়েও অধম। উল্লেখ্য তিনি ১৯৯৯ সালের ১৩ই মার্চ সমগ্র বিশ্বের প্রায় ২০০ ডক্টরেট ও মুসলিম দার্শনিকগণের মাধ্যমে যুগের শ্রেষ্ঠ রচনা হিসেবে ড. সিকান্দার আলী ইব্রাহিমী সাহেব কর্তৃক স্বর্ণপদক পেয়েছেন। বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষক ডাঃ হারুন-অর-রশিদ সাহেবের (লেকচারার, ডি.এম.সি) মতে বর্তমান বিশ্বে

Modern Astronomy বলতে যদি কিছু থাকে তার নাম হচ্ছে "মহা-ভাবনা"।

ধূম পিপাসা সর্বনাশা

১৯৮৯ সালে "ধূম পিপাসা সর্বনাশা" কিতাবের মাধ্যমে প্রকাশ করলেন কি উপায়ে ধুমপান করলে কোন ক্ষতি হয় না এবং কিভাবে ধুমপান ত্যাগ করা যায় তার একটি অব্যর্থ উপায় বলা হয়েছে। ইহা বহু পরীক্ষিত।

পীর ধরার অকাট্য দলিল

"পীর ধরার অকাট্য দলিল" লিখে প্রমাণ করলেন আল্লাহ্‌পাকের সান্নিধ্য পেতে হলে একজন খাঁটি পীর অবশ্যই ধরতে হবে। পৃথিবীর যুগশ্রেষ্ঠ সমস্ত আল্লাহ্‌র ওলীগণ সবাই যে পীর ধরেই মহামনীষী হয়েছেন, সে সম্পর্কে সঠিক আলোচনা করেছেন।

কয়েকটি কারামত

আল্লাহ্‌পাকের বড় বড় ওলীদের (কুতুব-উল-আকতাব) জীবনে মহান আল্লাহ্‌পাকের পক্ষ থেকে বিভিন্ন অলৌকিক ঘটনা ঘটে থাকে। যার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের ঈমানী শক্তি বৃদ্ধি পায়। তেমনি কিছু সংখ্যক অলৌকিক ঘটনা বা কারামত এখানে প্রকাশ করা হল।

* গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় বিচারপতি মোঃ আব্দুস সালাম সাহেবকে হাফেজ্জী হুজুরের খলিফা অধ্যাপক জনাব সামসুল আলম সাহেব, হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) এর লিখা "কাসদুল সাবিল" নামক এলমে মা'রেফতের একটি কিতাব পড়তে দিয়েছিলেন। বিচারপতি সাহেবের ভাষায়- "কাসদুল সাবিল" কিতাবখানা পড়া অবস্থায় আমি একদিন মানিকগঞ্জের হুজুর কেবলার সহিত জামাতে আসর নামাজ পড়ার জন্য মানিকগঞ্জ দরবার শরীফে যাই। আসরের নামাজ পড়ার পর আমি মোর্শেদ কেবলাকে সালাম প্রদান করি- 'আস্‌সালাম আলাইকুম'। সালামের জবাব দেওয়ার পর তিনি আমাকে বললেন, "আসর নামাজের পূর্বে, আমার এখানে আসার সময় আপনি 'কাসদুল সাবিল' কিতাবখানা পড়ে এসেছেন।" আমি বললাম, "জ্বী হুজুর" এবং তাঁর 'এলমে কাশ্‌ফ' সম্পর্কে অবগত হয়ে বিস্মিত হলাম।

* স্থান বয়রাঃ মোর্শেদ কেবলা মানিকগঞ্জের হরিরামপুরের বয়রা গ্রামে আব্দুল হালিম নামে একজন মুরিদের বাড়ীতে গিয়েছিলেন। তিনি তখন নীচের দিকে তাকিয়ে বললেন "মাটির নীচ দিয়ে তো ইলিশ মাছের ঝাঁক দেখা যায়"। ঐ মুরিদ তখন কিছু বুঝতে পারলো না, বুঝার কথাও না। আল্লাহ্‌র ওলীদের কথা বুঝাটাও একটা কারামত। বয়রা থেকে প্রায় সাড়ে পাঁচ মাইল দূরে পদ্মা নদী ছিল। কিছু দিনের মধ্যে এই সাড়ে পাঁচ মাইল জায়গা ভেঙ্গে ঐ মুরিদের বাড়ী সহ নদী হয়ে গেল। এখন সেই জায়গায় ইলিশ মাছের ঝাক দেখা যায়। জেলেরা অধিক সংখ্যক ইলিশ মাছ ধরার জন্য সেখানে যায়।

* স্থান ঃ সাটুরিয়া নন্দেশীতে - মোর্শেদ কেবলা একদিন আসরের নামাজ আদায় করতে দেরি হয়েছিল অর্থাৎ নামাজের সময় প্রায় শেষের দিকে। তখন সাথে কয়েকজন মুরিদ ছিল তাদেরকে তিনি বললেন "মসজিদের দরজা-জানালা বন্ধ করে দেও আমি নামাজ আদায় করি"। মসজিদের ভিতরে মোর্শেদ কেবলা একাই নামাজ আদায় করছিলেন। দরজা জানালা বন্ধ করে মুরিদরা বাইরে বসা ছিল, একটু পরে আব্দুল কাদের মোল্লা (মোর্শেদ কেবলার খাদেম) ভাই ভাবলেন কোন জানালা খোলা আছে নাকি দেখে আসি, তিনি মসজিদের দরজা দিয়ে ভিতরে তাকিয়ে দেখেন মোর্শেদ কেবলার জায়নামাজ মাটি থেকে এক হাত উপরে উঠে আছে এবং মোর্শেদ কেবলা শূন্যের উপরে নামাজ আদায় করছেন (আলহামদুলিল্লাহ্)। — চোখে দেখা সাক্ষী মোল্লা ভাই ও কয়েকজন মাওলানা সাহেবকে আল্লাহ্‌পাক আজও বাঁচিয়ে রেখেছেন।

* স্থান ঃ গোলাকান্দা – মোর্শেদ কেবলা রাতে বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে ছিলেন। সাথে মাওলানা মজিবুর রহমান লাহরী ও শওকত নামে দুই জন মুরিদ ছিলেন। তারাও ঘুমালেন। গভীর রাতে মাওলানা লাহরী সাহেব উঠে দেখলেন মোর্শেদ কেবলা বিছানায় নাই তখন তিনি ভাবলেন মোর্শেদ কেবলা কি এস্তেঞ্জায় গেলেন, ভাল করে খুঁজে দেখলেন নেই। মসজিদেও নেই। এদিক ওদিক খুঁজতে গিয়ে মাওলানা লাহরী ও শওকত সাহেব দেখলেন পশ্চিম পাশে পুকুরের মাঝখানে আকাশের উপর থেকে একটি উজ্জ্বল আলো এসে পরছে সেই আলোর মাঝখানে মোর্শেদ কেবলা জ য়নামাজ বিছিয়ে নামাজ পড়ছেন! (আলহামদুলিল্লাহ্)। কিছুক্ষণ পর জায়নামাজ সহ মোর্শেদ কেবলা পানির উপর দিয়ে ভেসে পুকুরের কিনারের দিকে আসতে লাগলেন, উপর থেকে আলোটাও আসছিল। তখন মুরিদ দুইজন ভাবলেন মোর্শেদ কেবলা যদি তাদেরকে দেখে রাগ করেন, এই ভেবে দুইজন এসে ঘরে শুয়ে পড়লেন। কিন্তু আল্লাহ্‌র ওলী বুঝতে পেরেছিলেন এরা দুইজন দেখে ফেলেছে, ঘরে এসে দুইজনকে বললেন "যা দেখেছো আমি জীবিত থাকা অবস্থায় কখনও কারো কাছে বলবে না"। –চোখে দেখা সাক্ষী মাওলানা মজিবুর রহমান লাহরী ও শওকত সাহেবকে আল্লাহ্‌পাক আজও বাঁচিয়ে রেখেছেন।

* ১৯৯৪ সালে উত্তর বাড্ডা ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল ও গুলশান কেন্দ্রীয় মসজিদের খতিব আলহাজ্ব হযরত মাওলানা মোঃ শামসুল হক সাহেব হজ্ব করতে যাবেন, তখন তিনি কুতুব-উল-আকতাব হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আয্‌হারুল

ইসলাম সিদ্দিকী সাহেবের (রহঃ) নিকট দোয়ার দরখাস্ত করেন। মোর্শেদ কেবলা প্রিন্সিপাল সাহেবকে বললেন "মদীনা মনোয়ারায় মসজিদে নববীতে নামাজ আদায় করার পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর রওজা মোবারক জিয়ারতের সময় আমার সালাম ও দরূদ শরীফ দয়াল নবীজীকে (সাঃ) পৌঁছায়ে দিয়েন।'' প্রিন্সিপাল সাহেব হজ্জ করতে গেলেন, তিনি হুজুর (সাঃ) এর রওজা শরীফে গিয়ে বাংলাদেশ থেকে যারা সালাম পাঠিয়েছিল একে একে সবার নাম বলে সালাম দিচ্ছিলেন যেই মাত্র প্রিন্সিপাল সাহেব দয়াল মোর্শেদ কেবলার নাম বলে সালাম দিলেন সাথে সাথে হুজুরপাক (সাঃ) এর রওজা শরীফ থেকে সালামের জবাব আসল "ওয়াকুল্লাহু মিননি সালাম'' অর্থাৎ আমার সালামও তাঁহার নিকট পৌছায়ে দিও'' (সুবহানআল্লাহ্)। এ তরীকার ইমাম কুতুব-উল-আকতাব গরীব-ই-নেওয়াজ হযরত খাজা মাঈনুদ্দিন চিশতি (রহঃ) এর মত মানিকগঞ্জ পীর সাহেব হুজুর, দয়াল নবীজীর (সাঃ) পক্ষ থেকে সালামের জবাব পেলেন। —নিজ কানে শোনা ও চোখে দেখা সাক্ষী আলহাজ্জ হযরত মাওলানা মোঃ শামসুল হক সাহেবকে আল্লাহ্পাক আজও বাঁচিয়ে রেখেছেন।

দুনিয়াবীভাবে পর্দার আড়ালে

হুজুরপাক (সাঃ) যখন দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যাবেন তার কিছুদিন পূর্বে তাঁর আদরের নাতীদ্বয় হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) ও হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) একই রাতে একই স্বপ্ন দেখে ভয়ে নিশ্চুপ হয়ে পরেছিলেন। তখন তাদের সকল কাজের উৎস, প্রাণাধিক প্রিয় নানাজানের (সাঃ) নিকট এসে দুই ভাই বললেন, "নানাজান আমরা দুইভাই গতকাল রাতে একই স্বপ্ন দেখে ভয় পেয়েছি''। হুজুরপাক (সাঃ) বললেন নানাভাই কি দেখেছ আমাকে বল, তখন বড় ভাই ইমাম হাসান (রাঃ) বললেন "আমি দেখলাম আমাদের চারিদিকে খুব বিপদ, প্রচন্ড ঝড় হচ্ছে, কোথাও আশ্রয় পাচ্ছি না, দুই ভাই ভয়ে দৌড়াদৌড়ি করছি, এমন সময় একটি বড় গাছ দেখে দুই ভাই ঐ গাছের নিচে গিয়ে আশ্রয় নেই, একটু পরে হঠাৎ জোরে বাতাস এসে গাছটিকে ভেঙ্গে নিয়ে যায়।'' তখন দয়াল নবীজী হুজুর (সাঃ) কনিষ্ঠ নাতী ইমাম হোসাইন (রাঃ) কে বললেন "নানাভাই তুমি কি দেখেছ বল?" তিনি বললেন "নানাজান আমি হুবহু একই স্বপ্ন দেখেছি''। তখন দয়াল নবীজী হুজুর (সাঃ) কলিজার টুকরা দুইভাইকে জড়িয়ে ধরে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে বললেন "ভাইদ্বয় খুব শিঘ্রই তোমরা তোমাদের নানাভাইকে হারাবে, তোমাদের নানাভাই দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যাবে'' এ কথা শুনে শিশু ভাইদ্বয় (রাঃ) গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদতে শুরু করেছিলেন। তাই দুনিয়া থেকে বিদায় হওয়ার কথা সর্বপ্রথম নাতী ভাইকে বলাটাও সুন্নত। হুজুরপাক (সাঃ) এর খাঁটি ওয়ারিস দয়াল মোর্শেদ কেবলা দুনিয়া থেকে বিদায় হওয়ার কথাটি বিদায় হওয়ার কিছুদিন পূর্বে সুন্নতস্বরূপ তাঁর আদরের নাতী- নাতনী ভাইদেরকে বলেছিলেন। তিনি সারা জীবন অজস্র পরিশ্রমের ফলশ্রুতিতে ৬৭ বছর বয়সে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। **সেদিন ছিল ২০০০ সালের ২১ শে মে রবিবার দিবাগত রাত্রি অর্থাৎ সোমবার,** মোর্শেদ কেবলা কন্যাদেরকে বললেন আমাকে ভাল করে গোসল করিয়ে দাও। সবাই তাঁকে গোসল করিয়ে দিলেন। বেশ কিছুদিন অসুস্থ থাকার কারণে খুব অল্প আহার করতেন। কিন্তু সেদিন বললেন, "আমাকে খাবার দাও আমি আজকে খাব"। তিনি ভাল করে খাওয়া দাওয়া করলেন, তারপর এস্তেঞ্জা সেরে ওজু করে বিছানায় শুতেই শরীর খুব খারাপ লাগছিল। বিছানায় শুয়ে বড় বড় শ্বাস নিতে নিতে "পাছ আন ফাছ" সবক (নিঃশ্বাস নিতে আল্লাহ্- ছাড়তে হু) করছিলেন। কিছুক্ষণ সবক করতে করতে সমস্ত শরীর নিস্তেজ হয়ে যায় এবং বিশ্বের প্রায় এক কোটি ত্রিশ লক্ষ মানুষের নয়নমনি, কুতুব-উল-আকতাব, অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের আধ্যাত্মিক জ্ঞান সম্পন্ন হুজুরপাক (সাঃ) এর এই খাঁটি ওয়ারিস সকলের বুক খালি করে দুনিয়াবীভাবে পর্দার আড়াল হয়ে গেলেন।

মোর্শেদ কেবলার মহা-মূল্যবান কয়েকটি বাণী

- জীবনের প্রথম শাখে যে কোকিল প্রথম ডাকে, হোক সে কুৎসিত কালো, তবু জীবনের আলো।
- প্রায় দেড় হাজার বছর আগে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কি কথা বলেছেন, যুদ্ধের সময় কোন কথা বলতেন, হযরত আলী (রাঃ)-কে ঘাড়ে করে পানি আনতে বলেছেন। সব কথা আজও বাতাসে ভেসে বেড়ায়।
- হুজুরপাক (সাঃ) বলেছেন "বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে মাত্র ৭০ হাজার খাঁটি ঈমানদার থাকবে" তুমি বসে বসে ভাব তুমি এ পরীক্ষায় টেকো কিনা।
- বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে কলেমা "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্''-র ধ্বনীতে প্রতিধ্বনীত হবে।
- একটি কথা তিনি, লক্ষ্য লক্ষ্য মানুষের সামনে প্রায়ই বলতেন তা'হলো "আমাকে যদি কেউ কখনো পান খাওয়ার সময় ডান হাতের পরিবর্তে বাম হাতে চুন খেতে দেখেন এবং কোন সুন্নত এমনকি একটি মোস্তাহাবেরও খেলাপ করতে দেখেন, তাহলে আমার মুরিদ হয়ে যদি আমাকে সংশোধন করে না দেন তাহলে কেয়ামত পর্যন্ত ঠেকা (দাবি) থাকবেন।
- মূর্খ্য লোকের ঈমান কচু পাতার পানি।
- উঠ, জাগ, অভিষ্ঠ সিদ্ধির আগে ক্ষান্ত হইও না।
- আমার একটা অনুরোধ, হাদীস শরীফে যা আছে যেমন আছে এবং কোরআন শরীফে যা আছে যেমন আছে তেমনভাবেই জীবন চালাতে হবে। এর বাইরে আমার ধারে (নিকট) যে বয়াত (মুরিদ) হইয়া থাকেন কোন বুদ্ধি খাটাইতে পারবেন না, যদি খাটান আমি তার পীর না, সে আমার মুরিদ না।

- মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞানে ক্রমাগতভাবে এমন উন্নতি করছে যে, এরপর মানুষ আর মানুষ থাকবে না, খালি জ্ঞানই হবে। যদি কেউ হেটে যায় মানুষ বলবে একটা জ্ঞান হেটে যায়, এত জ্ঞানী মানুষ হবে এরকম হতে হতে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনকে অস্বীকার করবে (নাউজুবিল্লাহ্), করতে করতে আবার খুব যদি জ্ঞানী হয় তখন সে ফিরে আবার আল্লাহ্পাকের কুদরতী পায়ে পরে কান্দা শুরু করবে (আলহামদুলিল্লাহ্)।
- কোন শব্দ শুরু হলে সেটা কোথাও যেয়ে শেষ হয় না, যেতেই থাকে, পৃথিবীর অন্য প্রান্তে যেয়েও শেষ হয় না, এভাবে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে যায়, যেতে যেতে আল্লাহ্পাক পর্যন্ত যায়।
- ঘর যেমন মানুষকে আকাশ হইতে বিচ্ছিন্ন করে রাখে, মানুষের মনের ঘরও তাকে আল্লাহ্ থেকে (অনন্ত থেকে) বিচ্ছিন্ন করে রাখে।
- তুমি দেখিতেছ পাহাড়গুলি স্থির হইয়া রহিয়াছে। অথচ উহা মেঘের ন্যায় চলাফেরা করিতেছে।
- বান্দার চোখের পানির সঙ্গে এবং জেকেরের সঙ্গে আল্লাহ্ পাকের একটা দারুন রকমের সম্পর্ক আছে।
- তোমার দুর্বল ঈমানের সঙ্গে একটা সবল ঈমানের যোগ কর।
- একটা মানুষের কাছে না গেলে মানুষ মানুষ হয়না।
- এলেমের যখন মৃত্যু হয়, আলেম তখন আলেম হয়।
- জগৎ জোড়া একই মোর্শেদ চিনে কয়জনা, মোর্শেদের মরণ হয় না কোন কালে।
- দেখলে তাঁরে দেখার মত, সাধনা কি লাগত এত? ভাবলে তাঁরে ভাবার মত, ভাবনা রইত না আর।

বিঃ দ্রঃ এখানে খুব সংক্ষেপে এ মহান আল্লাহ্র অলীর পরিচিতি প্রকাশ করা হলো। সিদ্দিকীয়া ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে মোর্শেদ কেবলার সম্পূর্ন জীবনী বের হতে যাচ্ছে।

অবতরণিকা

মানুষ আর পশু একই প্রাণী, তফাত হচ্ছে বিবেকে। তাই বলা হয় Man is a rational animal. পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট একজন মানুষকে যদি পশু বলা যায় সে ক্ষেপে ওঠে। কিন্তু একটা পশুকে যদি মানুষ বলা যায় সে খুশী হয় না। কারণ সে জানে যে সে পশু। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই জানেনা যে সে মানুষ নয়। তাই সে যা নয় তা তাকে বললে সে ক্ষেপে যায়।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা যা জানি তা মোটেই প্রকাশ করিনা এবং যা জানিনা তা প্রকাশের জন্য খুবই তোলপাড় করি। অন্ধ ঔৎসুক্য এমনই মারাত্মক নেশা যা মানুষকে চরম অধঃপতনে নিয়ে যেতে পারে তার জ্ঞানের অলক্ষ্যে। **জ্ঞানের জন্য ঔৎসুক্য থাকা ভাল। কিন্তু ভাল যখন বল্গাহীন হয় তখন মন্দতে যে সবচেয়ে মন্দ, তার চেয়েও মন্দ হয়ে যেতে পারে।** সুতরাং সব ক্ষেত্রে প্রশ্ন করা ভাল নয়। যুক্তির স্তিমিত অবস্থায়ই বিশ্বাসের মৌলিক কারণের উৎস। আব্রাহাম লিংকন বলেছেন, Reason more where reason is possible but don’t urgue at all where reason is not possible, (যেখানে যুক্তি খাটে, বেশি করে যুক্তি করবে কিন্তু যেখানে যুক্তি খাটেনা সেখানে মোটেই যুক্তি করোনা)। যে লোক বলে, যতই সে জ্ঞানী হোক, আমি যা বললাম এ ছাড়া আর জ্ঞান নেই- সে মূর্খ। যে বলে আমি জানিনা সে অনেক জেনেছে।

মরণ একটা দারুণ রহস্যপূর্ণ ব্যাপার। মানুষ মরে যায় কোথায় ? আসলে কি মানুষ সত্যিই মরে ? নাকি আমাদের ধারণাটা যাকে আমরা মৃত ব্যক্তি বলি তার সম্বন্ধে পাল্টে যায়। আমরা ভাবি সে মরেছে। আসলে সে মরেনি। সে এখন একটা নিরব জীবনে আছে। এটা অত্যন্ত বাস্তব জীবন, সে জীবন সুপ্ত জাগ্রত। আসলে আমরাই মরে আছি। ওই এখন এইমাত্র জন্মগ্রহণ করল। চিরদিন আমরা শুনে আসছি, বলে আসছি অমুকে মরে গেল। এসো অমুকের মৃত্যুতে আমরা বাংলা, ভারত, রাশিয়া, এশিয়া, আমেরিকা, অ্যান্টার্টিকা ইত্যাদির সভ্য মানুষেরা ৫ মিনিট নিরবতা অবলম্বন করে শ্রদ্ধা জানাই। অর্থাৎ জীবনে অন্তত পাঁচটা মিনিটের জন্যও মরণ বলে একটা মিথ্যা কথা স্বীকার করি। মরণকে মিথ্যা কথা বলেছি শুনে অনেকে অন্য রকম ভাবতে পারে। আসলে মরণ বিশ্বাস করে কয়জন। মরণের কথা মনে হলে মনের কোণে যেন মনে হয় আমি মরব না কোনদিন। অমুক নারী বা পুরুষ মরবে আমি মরব না। এই যে অনবরত মরণ সম্বন্ধে একটা প্রচ্ছন্ন অবিশ্বাস এটাই বহু প্রতিভাবান মানুষের জীবনে অপমৃত্যুর কারণ হয়ে

দেখা দিয়েছে। আপনি বলবেন মরণ সম্বন্ধে এত চিন্তা করে লাভ কি? তাইতো বলছিলাম, কয়টা মানুষকে ভাবনা প্রবণ মানুষ মনে করা যায়। কারণ মরণ এমন জিনিস যা শুধু জীবনেই ঘটবে। মরণে ঘটবে না। একবার ঘটলে দু'বার ঘটবে না এবং যদি একবার মরণ হয় তবে যা মরলে একবারই মরলে, যা যাবার একবারই গেলে দুনিয়া ছেড়ে, দ্বিতীয়বার আর কোনদিনও ফিরে আসবে না। যদি ভুল করে কিছু রেখে যাওয়া যায় নেবার জন্য আর ফিরে আসতে পারা যাবে না। দুনিয়ার মামলায় যদি নীচের কোর্টে মার খেয়ে যায়, কেউ ওপরের আপিলের কোর্ট পাবে। কিন্তু মরণের মামলায় কেউ যদি একবার মার খেয়ে যায় তবে আপিলের জন্য কোন কোর্ট-কাচারী আর থাকবে না। সুতরাং আপনি যখন আপনাকে একেবারেই ছেড়ে যাবেন, একেবারেই আপনি যা কোনদিনই ছিলেন না তাই হবেন এবং এ মহাসংকটময় সময় আপনার জীবনে আসবেই। আপনি বিশ্বাস করুন আর না-ই করুন আপনাকে সামনে রেখেই আপনাকে বাদ দিয়ে লোক গণনা করা হবে। সে সমস্যা জীবনে একদিন আসবেই। আপনার বিবি বিধবা হবেই, সন্তানগণ এতিম হবেই, সেটাকে খুব হলকা সমস্যা মনে করা উচিত নয়!

অনেকের মনেই এ প্রশ্নটা জাগে, মানুষ মরণের পরে কি হয়? হিন্দুরা পুড়িয়ে দেয়, মুসলমানরা বা খৃস্টানরা মাটিতে গলিয়ে দেয়। অনেকেই অনেক রকম বিশ্বাস করে। কেউ বলে মানুষ মরার পরে শেষ হয়ে যায়, মাটিতে মিশে যায়, মরণের পূর্ব পর্যন্তই মানুষের জীবন। মরণের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবন চিরদিনের মতই ইতিপ্রাপ্ত হয়। বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করে দেখা যাক, আসলে মরণের পরে মানুষের জ ীবনে কি পরিণতি হয়! বিজ্ঞানের মতে, মানুষ বলতে কিছু নেই অসংখ্য পরমাণু দিয়ে একটা মানুষের মূর্তি সৃষ্টি হয়েছে। প্রয়োজনবোধে পরমাণু নিয়ে একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে হয়।

আগের দিনে পরমাণুই ছিল বস্তুর ক্ষুদ্রতম অংশ। কিন্তু বিজ্ঞানের ক্রোমোন্নতির সঙ্গে এ তত্ত্ব পালটে গেছে। এখন রাদারফোর্ড থেকে আরম্ভ করে আধুনিক বোহরের তত্ত্বে পাওয়া যায়, একটা পরমাণুর ভেতরে রয়েছে আরও ক্ষুদ্রতম মূল কণিকা। প্রায় ১০০ (একশত) প্রকার মূল কণিকার অস্তিত্ব প্রকাশিত হয়েছে। তাদের তিনটি হচ্ছে স্থায়ী (Stable Element) আর বাকীগুলো হচ্ছে অস্থায়ী (Unstable Element)। স্থায়ী (Element) গুলো হচ্ছে ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন; অস্থায়ীগুলোর মধ্যে পজিট্রন (Positron), নিউট্রিনো (Neutrino), এন্টিনিউট্রিনো (Anti-neutrion) ও মেসন (Meson) ইত্যাদি প্রধান। একটা পরমাণু (Atom)-এর ভেতর ইলেকট্রন প্রোটনগুলো ঘূর্ণীয়মান অবস্থায় একটা সৌর বিশ্বের নিয়ম পালন করে চলছে। একটা ইলেকট্রন, প্রোটনের সঙ্গে এমন বজ্র বন্ধনীতে আটকে রয়েছে যে, যদি কোনক্রমে একটা ইলেকট্রনের বজ্র আটুনি থেকে একটা প্রোটনকে বিচ্যুত করা সম্ভব হয়, তাহলে যে প্রচন্ড বিস্ফোরণ হবে তাতে

আইনস্টাইন বলেন, অবিভক্ত ভারতকে জ্বালিয়ে শেষ করে দেয়া যাবে।

দেহতত্ত্ব বিজ্ঞানীরা বলেন ত্রিশ কোটি কোটি কোষ দিয়ে একটা মানুষের দেহ তৈরি হয়েছে। প্রতিটি কোষে রয়েছে যথাক্রমে-প্রোটোপ্লাজম (Protoplasm), সাইটোপ্লাজম (Cytoplasm)। সাইটোপ্লাজমের ভেতরে রয়েছে নিউক্লিয়াস (Nucleus), নিউক্লিয়াসের ভেতরে রয়েছে ক্রোমোজম (Chromosome) এবং ক্রোমোজমের ভেতরে জিন (Gene) রয়েছে, আর জিনগুলোর ভেতরে নিউক্লিক এসিড (Nucleic acid) চলমান অবস্থায় বিরাজ করছে। এই নিউক্লিক এসিডই হচ্ছে মানুষের জীবনীশক্তির উৎস।

বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে- মানুষ কোন বস্তু সৃষ্টিও করতে পারে না আবার ধ্বংসও করতে পারেনা (The law of conservation of Mass and Energy)। মানুষ চেষ্টা দ্বারা বস্তুর রূপ বা আকার ইত্যাদি শুধু পরিবর্তন করতে পারে মাত্র। এ হিসেবে কোন বস্তুকে আগুনে পুড়লে বা পানিতে গলিয়ে দিলে এ বস্তু (Atom) কোনদিন কোনকালেই ধ্বংস হয় না, শুধু অন্যরূপে পরিবর্তিত হয় মাত্র। ঐ **বস্তুর পরমাণুগুলো যে কোনরূপে রূপান্তরিত হোক না কেন চিরকাল তাজা থাকে**। কোনদিন ধ্বংস হয় না।

মানুষকে মানুষ ভেবে যারা মানুষের মরণের ব্যাখ্যা দিয়ে বলে মানুষ মরে যায়, শেষ হয়ে যায়, তারা হয়ত ভাবতে সময় পায়নি মানুষ আসলে কি ?

মানুষ একটা চলমান বস্তুপিন্ড

মানুষ বলতে কোন কিছু নেই। কোটি কোটি এ্যাটমকে (Atom) একত্রে জড় করে মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছে। দেহ বিজ্ঞানের মতে জীবকোষ বিভক্ত হতে হতে প্রথম কোষ থেকে মাত্র পঞ্চাশ বা বায়ান্ন বার বিভক্ত হলেই প্রায় ত্রিশ কোটি কোটি কোষের অভিনব এবং অবিশ্বাস্য ভাবে মনুষ্য সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। বিজ্ঞান অনেক প্রশ্নের জবাব দিতে পারে না। তার একটি হচ্ছে জীবকোষগুলো কেন বিভক্ত হয় ? এবং প্রথম জীবকোষটি ত্রিশ কোটি কোটি হতে মাত্র ৫০ থেকে ৫২ বার বিভক্ত হতে হয়। এটা কেমন করে সম্ভব? এবং এটাও খুবই আশ্চর্য বিষয় এই যে, গোটা মানব দেহটার এই যে পূর্ণ গঠন ও অবয়ব, এ সম্পূর্ণ শরীরটার কোটি কোটি এ্যাটমগুলো কিভাবে পরস্পর সামঞ্জস্য রেখে দেহকে এত সুষ্ঠভাবে খাড়া করে চালিয়ে নিয়ে যায়। বিজ্ঞানের মতে প্রতিটি এ্যাটম তার নিজস্ব ক্ষমতায় ও শক্তিতে দেহে জীবন্ত থাকে। **দেহ জীবন্ত থাকে বলে এ্যাটম জীবন্ত বা তাজা থাকে তা নয়।** এবং বিজ্ঞানের এই গূঢ় কথাটি উপলব্ধি না হলে মানুষ সম্বন্ধে যত বড় জ্ঞানীই হোক না কেন, তার চিরদিনই একটা ভ্রান্ত ধারণা থাকবে। কোন সমস্যার মৌলিক তত্ত্ব সম্বন্ধে যদি কারও ভ্রান্তি থাকে তবে ঐ সমস্যার পরবর্তী সিদ্ধান্তগুলোর কোনটাই শুদ্ধ হবে না।

মানবদেহের অণুগুলো জীবন্ত এবং জৈব শরীরের যত বিবর্তনই হোক না কেন দেহের অণুগুলো কোনকালেও ধ্বংস হয় না। এরা বিভিন্ন রূপান্তর গ্রহণ করে মাত্র। যারা মনে করে মানুষ মরে গেলে তার দেহটা পঁচে যায় বা আগুনে পুড়লে ছাই বা ভস্ম হয়ে যায়, তাদের এই ধারণাটা একটা অলীক ও সেকেলে ধারণা। মরার পরে মানবদেহ পুড়েই যাক বা গলেই যাক বা দুর্ঘটনায় ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাক বা জীব জন্তুতে ভক্ষণ করুক মানুষ কোনদিনই ধ্বংস হয় না। আসল ঘটনা হচ্ছে, **অসংখ্য অণুকে একটা প্রচ্ছন্ন জীবনীশক্তির অচ্ছেদ্য বন্ধন দিয়ে জালকের মত জড়িয়ে দেহকে চলমান করে রাখা হয়েছে। অণুগুলো আপন শক্তিতে স্বকীয় স্বত্ত্বায় দেহে অস্তিত্বমান আছে।** এই অদৃশ্য জীবনী শক্তিকে জীবাত্মা বলে ধারণা করা হয়েছে, যার কারণে দেহের ভেতরে নিউক্লিক এসিড সক্রিয় থাকে, তাতে করে মানবদেহ সজীব থাকে এবং দেহের বিভিন্ন সিস্টেমগুলো কর্মক্ষম থাকে। যার ফলে মানুষ তার অনুভূতির জৈব বহিঃপ্রকাশ করতে সক্ষম হয়। যেমন সুখানুভূতি বা বেদনাবোধে হেসে বা কেঁদে মুখ ভঙ্গিমায় ঠোঁট নেড়ে চেড়ে প্রকাশ করতে পারে। অন্যান্য ক্ষেত্রে অঙ্গ নড়াচড়া করে জৈব অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ করতে

পারে। **জীবাত্মা যখন নিরব হয় দেহের সকল অঙ্গের সকল অণুগুলোর তার সঙ্গে মরণ ঘটে না। তারা অবিকল তাজা থাকে এবং দেহের সর্ব প্রকার অনুভূতি বিরাজ মান থাকে।** যেমন, হাসি-কান্না, বোধ-বেদনা ইত্যাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়গুলো অবিকৃত অবস্থায় ঠিক থাকে। কিন্তু জীবাত্মা না থাকার কারণে ইন্দ্রিয়গুলো স্তিমিত অবস্থায় স্পন্দনহীনভাবে থাকে। যেমনঃ অত্যন্ত দুর্বল রোগী দেখে, শোনে, মশা দংশন করলে অনুভব করে, নড়াচড়া করতে পারে না। চাঁদনী শুভ্রা যামিনী আর পাপিয়ার গান তারে মাধুরিমা দেয়। বসন্তের দক্ষিণা মলয় তাকে স্বাপ্নিক করে তোলে কিন্তু সে কাউকে তার মনের কথা খুলে বলতে পারে না। তার বোবা মন শুধু অনুভূতিশীল কিন্তু অভিব্যক্তিহীন নির্বাক। মানুষের মরণের পরেও ঠিক এমনি ঘটনা ঘটবে। দেহের অসংখ্য অণুগুলো জীবাত্মার সান্নিধ্যে থাকাকালীন তাদের অজৈব শরীরে জৈব শক্তির একটা নিবৃত প্রবাহ সক্রিয় হয়ে থাকবে, যেমন- চুম্বকের সঙ্গে থাকতে থাকতে সাধারণ লোহাও চুম্বক শক্তিপ্রাপ্ত হয়, চুম্বকপ্রাপ্ত লোহার টুকরাটি যেখানেই সরিয়ে নেয়া যাক, আসল চুম্বকের গুণাগুণ তার মধ্যে বিরাজ মান থেকে যায় যদিও সে আসল চুম্বকের মত শক্তিশালী না থাকুক।

দেহ থেকে যখন জীবনীশক্তি বা চলচ্ছক্তি সরে যায়, মানুষকে কবরে নেয়া হয়, যখন মানুষটি কবরের ভেতরে নিরব হয়ে শুয়ে থাকে কিন্তু তার দেহে সম্পূর্ণ অনুভূতি শক্তি বিদ্যমান থাকে এবং এটা অত্যন্ত জটিলতর ভাবেই থাকে। যেভাবে চলমান মানুষের অনুভূতি সর্ব অঙ্গে বা বিভিন্ন অঙ্গে বিভিন্ন ভাবে থাকে, ঠিক এভাবে কবরের মানুষের মধ্যে অনুভূতি থাকে না। প্রশ্ন হতে পারে, দেহ যখন পঁচে গলে যায় অথবা পুড়িয়ে দেয়া হয় তখন অনুভূতি কোথায় থাকে। কথাটা ভাববার মত। আমরা স্থূল জ্ঞান দিয়ে এবং স্থূল চক্ষু দিয়ে যা বুঝি বা দেখি তার বাইরেও অনেক অনেক বিষয় আছে যা স্থূলজ্ঞানে বা যুক্তিতে বা দৃষ্টি শক্তিতে ধরা পড়ে না। প্রেমানুভূতি, ভালবাসা, ব্যাধিপীড়ার যন্ত্রণা, ব্যর্থতার অভিক্ষেপ, সর্প দংশন জ্বালা, বিচ্ছেদ-বেদনা, প্রসব ব্যথা ইত্যাদি আরও অনেক বিষয় আছে যা কোনদিন জ্ঞানে বা যুক্তিতে বা দৃষ্টিতে ধরা পড়বে না। দেখিনা-বুঝিনা-জ্ঞানে খাটে না বলে সব বিষয় বা স্বত্বাকে বা সত্যকে উড়িয়ে দেয়া যাবে না। সারা দুনিয়ায় বিলকুল মানুষ যদি পুরুষ হয় এবং তার মধ্যে মাত্র একজন নারী থাকে এবং সে প্রসব ব্যথায় ভোগে, দুনিয়ার কোন বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক বা যে কোন নম্বরের জ্ঞানীলোক এই একটি প্রসব ব্যথা অনুভূতি জ্ঞান খাটিয়ে বা যুক্তি দিয়ে অনুধাবন করতে পারবে না এবং পারবে না বলেতো প্রসব ব্যথাকে অস্বীকার করা যাবে না।

কথাটার সার হয় এই, সারা দুনিয়ার সমস্ত জ্ঞানী-গুণীকে একজন নারীর নিকটে মাথা নত করে একটা সত্যকে মেনে নিতে হবে, সে যেমন করে ব্যথার কথা বলে! ঠিক তেমন করে মেনে নিতে হবে। কোন যুক্তিই চলবে না। কবরে মানুষ কেমন হয়, মরণ কি, মরণের পরে কেমন ঠেকে, প্রিয়জনহারা হয়ে চির কাঙ্গাল হলে, বেদনাতুর হৃদয়ে রোরুদ্যমান স্ত্রী কাফনের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বেদনাশ্রু স্বামীর আর্ত দেহের উপর ঝরাতে

থাকলে, স্নেহসিক্ত সন্তানরা এতিম হয়ে কাফন ধরে টানতে টানতে নিস্তব্ধ পিতার বুকে মাথা ঠুকলে, কেমন যে লাগে তা শুধু ঐ প্রসব ব্যথাবিদ্ধা নারীর মত, ঐ বিদায়ী পথিকটিই অনুধাবন করতে পারবে। আর কেউ জ্ঞান দিয়ে বুঝতে পারবে না।

অনেক অনেক সমস্যা আছে যা ঐ সমস্যায় না জড়ালে বোঝা যাবে না। যতদিন স্বাস্থ্য ভাল থাকে ব্যাধি পীড়ার যন্ত্রণা কোনদিন অনুমানে ধরা পড়বেনা। যতদিন দাঁত থাকে দাঁত হারালে কি ঘটে তা অনুভব করা যায় না। এমনি যতদিন দেহে জীবন থাকে মরণের অভিজ্ঞতা বুঝে আসা সম্ভব নয়। মরণই একমাত্র মরণের অভিজ্ঞতা সম্যকভাবে দিতে পারে। প্রশ্ন হতে পারে মরণের পরে দেহ যখন এলিয়ে যায়, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, দেহের কোষগুলো কোটি কোটি ভাগে বিভক্ত হয়ে শশ্মানে ছাইয়ে পরিণত হয় বা কবরের মাটি শুকিয়ে ধূলিকণা হয়ে হাওয়ার সঙ্গে জীবদেহের পরমাণুগুলো মিশে তেপান্তরের অন্তরালে হারিয়ে যায় অথবা পানিতে ডুবন্ত মানুষেকে মাছে খায় বা বিমান দুর্ঘটনায় ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে বিভিন্ন জীবজন্তুর পেটে চলে যায় এমতাবস্থায় মানুষের অনুভূতি থাকার সিস্টেমইতো নেই।

আগেই বলা হয়েছে, মানুষ মরার পরে তার ইন্দ্রিয় অনুভূতি অর্থাৎ শ্রবণ শক্তি, দর্শন শক্তি, অনুভব শক্তি ইত্যাদি কিভাবে যে বিদ্যমান থাকে তা অত্যন্ত জটিল ব্যাপার। মানুষের নাভীস্থলটি হচ্ছে মানবদেহের দানা বা বীজ স্বরূপ। প্রতিটি ফল-ফসলের একটা বীজ আছে। এবারের ফসল হারিয়ে গেলে আগামীবার তার বীজ থেকে আমরা এবারের হারানো গাছটি অবিকল আসলরূপে-আসল স্বত্ত্বাসহই ফেরত পাই। যেমন ঃ একটা চাল কুমড়া গাছে ত্রিশটি কুমড়া ধরল। ত্রিশটা কুমড়া চাল থেকে নামিয়ে কাটলে ধরা যাক তিন হাজার বীজ তাতে হল। প্রত্যেকটি বীজে একটা করে বিরাট কুমড়া গাছ লুকিয়ে রইল। এই তিন হাজার বীজের প্রত্যেকটি থেকে আগামী বছর একটা করে চাল ভরা কুমড়া গাছ হবে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই বীজগুলোর প্রত্যেকটি ভাংগলে দেখা যাবে খোসার ভেতরে একটি করে সাদা শাঁস আছে। বিশ্বের কোন শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়েও ঐ শাঁসের ভেতরে কুমড়ার বড় বড় ঢালা সবুজ পাতা দেখা যাবে না, গাছের শিকড় দেখা যাবে না, কুমড়া দেখা যাবে না, ফুল দেখা যাবে না। তাহলে শুধু শাঁসের ভেতরে এত কিছু অতি গোপনে লুকিয়ে থাকতে পারল?

শুধু এ ক্ষেত্রেই নয় অন্যান্য ক্ষেত্রেও এমন আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। পাথরকুঁচি গাছের শুধু একটা পাতার খন্ডের ভেতরে সম্পূর্ণ আসল গাছটি লুকিয়ে থাকে। এই গাছের পাতা সিলেট থেকে তুলে নিয়ে আমেরিকার একটু ভেজা মাটিতে রেখে দিলে কিছুদিন পরে দেখা যাবে ঐ পাতায় ভর করে সিলেটের পাথর কুঁচির পাতার কণা আমেরিকায় আসল গাছ হয়ে জেগেছে।

মরণের পর মানুষ কিভাবে জীবন্ত থাকে ?

মানুষ একটা গাছ। জীবন্ত গাছ। বাকশক্তি সম্পন্ন আজব গাছ। মরণের পরে মানুষের নাভীস্থল কোনদিন ধ্বংস হয় না। কোটি কোটি পরমাণুর সমষ্টি হচ্ছে নাভীস্থল। একটা চাল কুমড়া গাছে যখন কুমড়া পাকে সম্পূর্ণ চাল ভরা কুমড়া গাছটি তার প্রত্যেকটি বীজের ভেতরে কি কৌশলে যে ঢুকে যায়, কেউ তা অনুধাবন করতে পারে না। একটা কুমড়া দানা ভাঙলে তা থেকে একটা সাদা শাঁস বেরিয়ে আসে, ঐ শাঁসটার ভেতরে যেমন কোন সবুজ পাতার মেলা দেখা যায় না, গাছের শিকড়, ফুল ইত্যাদি কিছুই দেখা যায় না। এগুলো অতি সুপ্তভাবে ঐ দানার ভেতরে জাগ্রত থেকে যায়।

মানুষের বেলায়ও ঠিক এমনই হয়। মানুষের যখন জীবাত্মা তিরোহিত হয় অর্থাৎ মরণের সময় ঘনিয়ে আসে তখন মানুষটা ঠিক কুমড়া গাছের ফলের মতই পাকে। সম্পূর্ণ কুমড়া গাছটি যেমন অতি অলক্ষ্যে প্রতিটি দানার ভেতরে ঢুকে যায় মানুষও জীবাত্মার অবসানে তার সম্পূর্ণ অঙ্গ- প্রত্যঙ্গ এবং অনুভূতি নিয়েই তার নাভীস্থলের ভেতরে অতি অলক্ষ্যে ঢুকে সুপ্ত হয়ে থাকে। নাভীস্থল আগুনে পোড়েনা, পানিতেও গলে না। ভিন্নরূপে রূপান্তরিত হতে পারে মাত্র। কিন্তু যে কোনভাবে রূপান্তরিত হোক না কেন আসল স্বত্বা ঠিকই থাকে। যেমন, বৈদ্যুতিক প্রবাহে নাভীস্থলকে পুড়িয়ে ছাই করে দিলেও ঐ ভস্মের ভিতরেই পরমাণু হয়ে মানুষটা সম্পূর্ণ অনুভূতি নিয়েই বিরাজমান থাকে। নাভীস্থলের প্রতিটি অণুই হচ্ছে মানুষের দানা। একটা কুমড়ার ভেতরের সব কয়টি দানাই যেমন একটি করে ফলপ্রসু বীজ, এর যে কোন একটি দানায় বা বীজে যেমন সম্পূর্ণ গাছটি নিখুঁতভাবে বিরাজমান থাকে, **মানুষের নাভীস্থলের মধ্যেও আছে কোটি কোটি অণু যার প্রত্যেকটি অণুর ভেতরে একটা করে আসল মানুষ তার সম্পূর্ণ আকৃতি অনুভূতি নিয়েই লুকিয়ে থাকে। সময় মত অনুকূল পরিবেশে এই দানা থেকে আবার আসল মানুষটি বের হয়ে পড়বে এবং কবে যে, সে দিন হবে, তা যিনি মানুষ সৃষ্টি করেন তিনিই ভাল জানেন।**

অন্যান্য সৃষ্টির তুলনায় মানুষের এত বীজ তার দেহে বিদ্যমান থাকে যে, মাত্র কয়েকটা মানুষের বীজ হলে এ রকম কয়েকটা দুনিয়ায় মানুষের ঠাঁই হত না। মানুষের পুনরায় সৃষ্টি হতে হলে এত বীজের দরকার হবে না। দেহের একটি পরমাণু খুঁজে পেলেই হবে। এই যে আলো হাওয়া ভরা কোলাহল মুখরিত মাটির পৃথিবীতে প্রিয়জন

ঘিরে মাটির মানুষ আমরা কর্মব্যস্ত প্রহরের সঙ্গে লতার মত জড়িয়ে থাকি, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কি যে ঘটে যায়। ঐ যে প্রাণ প্রিয় স্বামী কবরে চলে গেছে যুবতী বিবি ঘরে ফেলে, ঐ স্বামীর কবরটা শুকিয়ে গেছে তার দেহটা বিলীন হয়েছে মাটির বুকে। হয়ত আজ তার মনে পড়ছে নিরালা কবরে ধুলি হয়ে-

"কত পুরাতন পাতার মতন আমিও একদিন
এই ধরণীর ধূলায় মিলিয়া একদা আমিও হব বিলীন।"

চিরদিন কবিতা যে শুনেছে আজ সে নিজেই কবিতা হয়ে ধূলিতে বিলীন হয়েছে। সমাধির ধূলি মলিন পরমাণুগুলো আজ দক্ষিণা বাতাসে গোধূলীর আস্তরণের সঙ্গে মিশে খোলা জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকা স্ত্রীর মুখে আর বুকের সঙ্গে মেখে যাচ্ছে, তার গলার হারের সঙ্গে জড়িয়ে ভাংগা গড়ার সংগীত গেয়ে যাচ্ছে। বিয়োগবিধূর আত্মা তার অতৃপ্ত নয়নে স্ত্রীর বিচ্ছেদ বেদনাতুর সজল মুখখানির দিকে স্বতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে আছে। প্রত্যেক পরমাণুতে একটি করে স্বামী আছে। এভাবে একটি স্বামী কবরের ধূলিতে রূপান্তরিত হয়ে হাজার হাজার প্রিয় স্বামী হয়ে বিধবা স্ত্রীর দেহে বুকে জড়িয়ে আছে। নির্বাক স্ত্রী গোসলখানায় গিয়ে তার জীবন্ত স্বামীর অণুগুলোকে পানির স্রোতে ড্রেনে ভাসিয়ে দিচ্ছে। এত সুন্দর জীবন পেতে যেয়েও, কিছুই না পেয়ে কিভাবে তকদীরের কাছে হার মেনে হারিয়ে যায় চির জনমের মত। **গ্রামে-গঞ্জে, শহরের অলিতে-গলিতে, হাটে-মাঠে, পার্কে-গাড়ীতে, চলতে-ফিরতে, উঠতে-বসতে কত অজস্র নর-নারী আমাদের চোখে মুখে গায়ে হাতে চুলের ডগায় চশমার ফ্রেমে জড়িয়ে যায় ধূলি হয়ে। ওরা পূর্ণাঙ্গ মানুষ**। এক একটা পরমাণুর ভেতরে একটি করে জ্যান্ত মানুষ ধূলিরূপে মানুষের দেহে দেহেই লেগে থাকে। বাতাসে উড়ে ফুলের পাপড়িতে অসহায় হয়ে পড়ে থাকতে থাকতে প্রজাপতির পায়ে জড়িয়ে যায়। প্রজাপতি এসে প্রিয়জনের সম্মুখ দিয়ে উড়ে যায়, অজানা প্রিয়জনের খবর দিয়ে যায়। ওপারের মানুষের ব্যর্থতা জ ানিয়ে যায়।

কবরের নিশ্চিহ্ন মানুষ কেমন করে শোনে

মানবদেহ দীর্ঘদিন কবরে থাকলে তার দেহের রক্তমাংস, হাড় ইত্যাদি পঁচে গলে মাটির সঙ্গে মিশ খেয়ে যায়, নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এ মানুষ আবার কেমন করে শোনে। এটা আপাত দৃষ্টিতে অত্যন্ত অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। কিন্তু একটু সূক্ষ্ম চিন্তা করলে দেখা যাবে, এটা সম্ভব এবং খুবই স্বাভাবিকভাবেই সম্ভব। দেহ তত্ত্ববিদগণ অনেক ভাবনা চিন্তা করে বলেছেন, মানুষের মস্তিষ্ক যে কি অভিনবভাবে কাজ করে, কোন বিজ্ঞানী আজও তা ঠিক ঠাউরে উঠতে পারেননি। ব্রেনের কর্মধারা অবোধ্য, দুর্বোধ্য নয়।

বিশ্ববিখ্যাত মার্কিন দেহবিজ্ঞানী স্যার উইলিয়াম গ্রেমজার মন্তব্য করেছেন-একটা পিন মাটিতে পড়ে গেলে সেই পিনটা উপুড় হয়ে মাটি থেকে হাত দিয়ে তুলতে মস্তিষ্ক যে কিভাবে কাজ করে এবং কি কাজ করে বিশ্বের কোন দেহবিজ্ঞানী আজও মস্তিষ্কের এই আশ্চর্য কাজের সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারেনি। মানুষের মাথায় কিভাবে জটিল চিন্তাভাবনা আলোড়িত হয়, তার মাথা কিভাবে সূক্ষ্মতম ভাবনা চিন্তাগুলোকে শ্রেণীবিভাগ করে সুস্থভাবে কাজ করে যায় কোন দেহ বিজ্ঞানী আজও সঠিক করে বলতে পারেনি। তারা মস্তিষ্ক নিয়ে দুরূহ চিন্তা করতে করতে মস্তিষ্ক নষ্ট করার ব্যবস্থা করেছে তবুও কোন দুরতম পাল্লার রকেট চালিয়েও এত নিকটতম মাথার প্রান্তে পৌঁছতে পারেনি।

এখন স্বাভাবিকভাবেই ভাবতে হয় মানুষের এমন জটিল মাথাটা কতই না জটিলতম। যিনি মানুষের এই জটিলতম মাথা সৃষ্টি করেছেন তাঁর মাথাটা কতই না জটিলতম। যে জটিলতম মাথা মানুষের জটিল মাথাকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি একটা পরমাণুর ভেতরে অতি অবিশ্বাস্য অথচ ধ্রুবভাবে একটা পূর্ণ মানুষকে অতি গোপনে লুকিয়ে রেখে তার মধ্যে বিভিন্ন রকম অনুভূতি জিয়িয়ে রাখতে পারেন না ? একটা পরমাণুর ভেতরে একটা মানুষ লুকিয়ে থাকবে, তার শ্রবণ শক্তি, দৃষ্টিশক্তি, অনুভব শক্তি অর্থাৎ বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গুলো অবিকৃত অবস্থায় নিরব অবস্থায় সজীব থাকবে। যেমন ঃ 'আছর' নামে একটা ব্যাধি আছে সাধারণতঃ নারীদের বেলায় বেশী দেখা যায়। রাত্রে তন্দ্রাঘোরে এই ব্যাধি দেখা দেয়। হঠাৎ মনে হয় কি যেন তার দেহে ভর করল। হাত, পা অবশ হয়ে আসল। সারা দেহ যেন শিথিল হয়ে গেল। বাক রোধ হয়ে গেল। ঘরে অন্যান্য মানুষ জাগ্রত সে টের পায় তারা কথা বলে তা শোনে জ্ঞান অনুভূতি সব ঠিক থাকে কিন্তু কথা বলতে পারে না। দারুণ ভয় পেতে থাকে কিন্তু কাউকে ডাক দিতে পারে না। এভাবে

দীর্ঘক্ষণ পরে প্রভাবটা কেটে যায়। এই ব্যাধিটাকে গাঁ দেশে 'আছরের ব্যাধি' বলে। ডাক্তারী শাস্ত্রে এর কোন চিকিৎসা পাওয়া যায় না।

মানুষ মরার পরে অসংখ্য পরমাণুর প্রত্যেকটির ভেতরেই একজন করে মানুষ লুকিয়ে থাকবে তখন ঐ পরমাণুর ভেতরের মানুষটা ঐ আছরগ্রস্থ রোগীর মতই থাকবে-শুনবে, বুঝবে, কথা বলতে পারবে না। এই জন্যই মুসলমানেরা কবরে সালাম দেয়। কবরের মানুষেরা শোনে, প্রতি জবাব দেয়। এপারের স্থূল কানে তা শোনা যায় না।

পুড়িয়ে দিলেও হিন্দুরা মরে না

হিন্দুরা শবদেহকে আগুনে পুড়িয়ে দেয়। দেহের মাংস, হাড়, পাথরের মত শক্ত দাঁত সবই পুড়ে ভস্ম হয়ে যায়। কিন্তু নাভীস্থলটা কিছুতেই পোড়ে না। শক্ত জিংরা ধরে ছাই ভস্মের ভিতরে ঠিকরে পড়ে থাকে। ওটাকে হিন্দুরা সত্য নাড়ী বলে। এই সত্য নাড়ী একটা হাড়ির নীচে মাটির তলে শশ্মানে পুতে রাখে। এই নাড়ীটাই হল মানুষের দানা। একটা পাকা তালের আঁটি কাটলে দেখা যাবে শুধু সাদা শাঁস লেই লেই হয়ে আছে। ঐ শাঁসের ভেতরের অতি সূক্ষ্ম পরমাণুর ভেতরে একটা গগণচুম্বী তালগাছ মাথা গুঁজে নিরবে অচেতন হয়ে জীবন্ত রয়েছে। প্রশ্ন হতে পারে, পরমাণুর ভেতরে মানুষের কান কোথায়? কি দিয়ে শোনে। চোখ কোথায়? কিভাবে দেখে ইত্যাদি। একটা কুমড়া দানার শাঁসের ভেতরে কুমড়া গাছের পাতা, ফুল, নাক, কান যে ভাবে থাকে একটা মানুষ পরমাণুবীজের ভেতরে মানুষের সর্ব অঙ্গ ঐ ভাবেই থাকে। কবরের ভেতরেও মানুষের নাভীস্থলটা গোলাকার হয়ে পড়ে থাকে। দেহের সর্ব অঙ্গের অবসান হয়ে যায়। কিন্তু নাভীস্থলটা দীর্ঘদিন গোলাকার অবস্থায় কবরে জীবন্ত থাকে। দিন যায় ক্ষণ যায় অবশেষে এই নাভীস্থল ধীরে ধীরে এলিয়ে যায় এবং কবরের মাটির সঙ্গে মিশে মিশে কোটি কোটি মানুষ দানা হয়ে কবরে ঘুমিয়ে থাকে।

ভাবনাতুর কবির ভাষায়,

"কবরের মাঝে ঘুমাইয়া থাকে
কেরে স্বাপ্নিক ওরা;
শুধু শোনে কথা, কহে নাতো কথা
কত যে বর্ণচোরা।
নিরব ভাষায় কি ব্যথা জানায়
প্রিয়জন কাছে গেলে
বলিব সকলি একদা তোমরা
আমাদের মাঝে এলে।"

নিশ্চিহ্ন মানুষের কিভাবে কবরের আযাব হয়

মরণের পরে দু'ভাবে মানুষের আযাব হবে। একটি হচ্ছে অভ্যন্তরীণ আর একটি বাহ্যিক। একটি আত্মিক অন্যটি দৈহিক। কবরে অনন্তকাল পর্যন্ত মানুষ পরমাণুর ভেতরে তার বিবেক ও অনুভূতি নিয়েই জীবন্ত থাকবে। মানুষ দুনিয়ার মাটিতে বেঁচে থেকে সৎকাজ করলে তার পবিত্র আত্মা শান্তি পায়, অসংগত বা অসৎ কাজ করলে তার বিবেক যন্ত্রণা পায়। মনকে সাপের মত দংশন করে। নীতিশাস্ত্রও বলে বিবেকের দংশন হচ্ছে মানুষের সবচেয়ে বড় যন্ত্রণা। দুনিয়ায় যে যত বেশী কু-কর্ম করবে তার বিবেক তত বেশী আহত ও পীড়াগ্রস্থ হয়। জ্ঞানের অলক্ষ্যে বিবেক অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়। বিবেকের এই উত্তাপ ও জ্বালা অতি অলক্ষ্যে পরম আত্মার উপরে ক্রিয়াশীল হয়। আত্মাও দিনে দিনে (বলে রাখা ভাল আত্মা দু'প্রকারের, জীবাত্মা ও পরমাত্মা বা স্থায়ী আত্মা) তিলে তিলে ক্রিয়াশীল হয়ে চিরকাল পরমাণুরূপ দেহকে কঠিন আযাব দিতে থাকে। বিবেকের দংশন জ্বালাই হচ্ছে কবরের আত্মিক সাপ এবং বিবেকের যন্ত্রণাই হচ্ছে আযাব। নিজের অতীত জীবনের আহত বিবেক যখন দংশন করবে এটাই সর্প দংশন জ্বালা হয়ে সর্ব অঙ্গে দংশন করতে থাকবে কোন আগুন বাইরে থেকে কবরে জ্বালিয়ে দিতে হবে না। অন্তরের অসৎ কর্মের জালা-পোড়ই কবরে আগুন হয়ে জ্বলে উঠবে-একটা মানুষ তার অতীত জীবনকে তার সামনে হাজির দেখতে পাবে। সৎকাজ করলে শান্ত আত্মা শান্তিদান করবে। এভাবে অভ্যন্তরীণ শান্তি অথবা শাস্তি হবে।

নিশ্চিহ্ন মানুষের কিভাবে দৈহিক শাস্তি সম্ভব

দৈহিক শাস্তি কিভাবে সম্ভব। কারণ মরণের পরে তো দেহই থাকে না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কৃপণ ব্যক্তিকে কবরে একটা সাপ দংশন করতে থাকবে। তার বিষের তেজে তার মাথার পশম পরে গিয়েছে। চোখ দু'টো নীল হয়ে গিয়েছে। কবরে এসে বলবে ভাই, তোমার বুকে আমি থাকতে চাই। লোকটি প্রশ্ন করবে তুমি কে? সাপটি বলবে, আমি তোমার ধন-সম্পদ। দুনিয়ার সৎকাজে ব্যয় না করে সম্পত্তি বুকে আগলে রেখেছিলে এখন তোমার বুকে তেমনি আমি থাকব। এই বলে ঐ লোকটাকে যে দংশন শুরু করবে, কিয়ামত পর্যন্ত মূহূর্তের জন্য দংশন বন্ধ রাখবে না।

মহানবী (সাঃ) এর এই মহাবাণী থেকে এই প্রতীয়মান হচ্ছে, কবরে কৃপণ ব্যক্তিকে একটা সাপ কামড়াবে। লোকটার বুকে কামড়াবে, মাথায় বা অন্য অঙ্গে নয় এবং কিয়ামত পর্যন্ত মুহূর্তের জন্য কামড় বন্ধ হবে না। প্রশ্ন হতে পারে, নদীর ধারের কবরগুলোর মাটি ভেঙ্গে নদীর তরঙ্গে মিশে যাচ্ছে। কবরের মাটিগুলো ধুলি হয়ে ঝুর ঝুর করে নদীর পানিতে পড়ে গুলিয়ে গুলিয়ে তরঙ্গের টানে সাগরের বুকে গিয়ে মিশে অনন্তের পথে হারিয়ে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় কোথায় সাপ আর তার দংশন রইল? কৃপণ ব্যক্তি বা তার বুকটাইবা কোথায় থাকল? বিমান দুর্ঘটনায় শূন্যাকাশেই দেহটা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। মানুষের বুক বা সাপ কোথায় থাকল। অথচ মহানবী (সাঃ) দৈহিক দংশনের কথাই তো স্পষ্ট করে বলেছেন। অনেকে শুধু আত্মিক দংশনের কথাই চিন্তা করেছে। আলমে বরযখের শাস্তির কথাই তারা ভেবেছে। কিন্তু হাদিস শরীফে স্পষ্ট উল্লেখ আছে বুকে কামড়াবে অর্থাৎ দৈহিক শাস্তি হবে। এ সম্বন্ধে এখন আলোচনা করা যাক।

বিশ্ব ভুবনের বুকে মানুষের জ্ঞানের বাইরে অনেক ঘটনাই ঘটে যাচ্ছে যার সম্বন্ধে মানুষ কোন জ্ঞানই রাখেনা। প্রকৃতির অলক্ষ্য ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া মানুষের জীবনকে নিবিড়ভাবে আচ্ছন্ন করে আছে। প্রকৃতি ও মানুষের জীবনলীলা অত্যন্ত ওতোপ্রোতভাবে দুধ আর চিনি যেমন মিশে তেমনভাবে মিশ্রিত হয়ে আছে। আমাদের জীবন, মৃত্যু, মন-মানসিকতা, উদ্দীপনাশীলতা, অনুভূতি ইত্যাদি এক কথায় প্রকৃতির হাতে নিরবিচ্ছিন্নভাবে প্রভাবান্বিত হচ্ছে। বিজ্ঞান এর সম্বন্ধে অনেক তথ্যই দিয়েছে। মহাজ াগতিক রশ্মি (Ultraviolet Ray) -বেগুনি পারের রশ্মির খবরটা প্রতিটি ভাবনাপ্রবণ মানুষের প্রতিটি সুখের প্রহরের শান্তিকে নিদারুণভাবে বিঘ্নিত না করে পারে না।

বিজ্ঞানীরা বলেছেন, মহাজাগতিক রশ্মি বলে একটা অজানা মারাত্মক আলো মহাবিশ্বের কোন অজানা থেকে মাটির পৃথিবীতে পতিত হয়। এটা এমন অপ্রতিরোধ্য রশ্মি যেটা কোন প্রকার বাধা দিয়ে আটকে রাখা যায় না। দু'শো মাইল পুরু একটা লোহার দেয়াল দিয়েও যদি তাকে বাধা দেওয়া যায়, সে দেয়াল ভেদ করেই তেজস্কর রশ্মিটা মানুষের গায়ে এসে ঠেকে। দেহের চামড়া ভেদ করে কলিজায় ঢুকে যায়। দেহের তন্ত্রিতে তন্ত্রিতে আক্রমণ করে এবং প্রতি সেকেন্ডে মানব দেহের বিশটা করে অণুকে (Atom) ধ্বংস করে দিতে থাকে। মানুষের গোটা দেহটাতো অণু দিয়ে তৈরি। এই অণুই হচ্ছে জীবকোষের উপাদান।

কোটি কোটি অণু দিয়ে মানুষ সৃষ্টি হয়েছে এবং অণু যতক্ষণ সতেজ থাকে ততক্ষণ মানুষের জৈব দেহটায় চলচ্ছক্তি ঠিক থাকে দেহ খাড়া থাকে। বিশেষ শক্তির অনুপস্থিতিতে বা আদেশে মানব দেহের অণুর গঠন কাঠামো রূপান্তরিত হয়ে নির্জীবতায় বা জড়ত্বে পরিণত হওয়া মানেই মানুষের মৃত্যু। প্রতি সেকেন্ডে মানুষের মৃত্যু অনিবার্য এবং নিশ্চিতভাবে ঘনিয়ে আসতে থাকে অবশ্য খাদ্যে বা অন্যান্যভাবে অণুর এই ক্ষতি সাধন অনেকাংশ পুরণ হলেও সব অণুর ক্ষয়পূরণ সম্পূর্ণভাবে হয় না। এভাবে অণু ক্রিয়াশীলতা হারাতে হারাতে হয়তো রাত দু'টোর সময় ঘুম ঘোরে অণুগুলো প্রায় সম্পূর্ণ নির্জীব হয়ে যায় এবং ঘুম ঘোরেই মানুষটা চিরদিনের মত নিরব হয়ে ইহলীলা ত্যাগ করে। এটা খুবই ভাববার কথা যে, কখন যে কার দেহের অণুগুলো নির্জীব হয়ে চিরদিনের মত দেহটা নিশ্চল হয়ে যাবে রাতে কি দিনে, শীতে কি গ্রীষ্মে, অফিসে কি মিলনের লগ্নে কেউ তা বলতে পারবে না। এই বেলায় প্রতিটি জ্ঞানী গুণী পণ্ডিত ব্যক্তি নিরবে যুক্তিহীণভাবে প্রকৃতির মালিক আল্লাহ্‌কে নিরবে মেনে নেয়। সে যত বুদ্ধিমত্তার অধিকারীই হোক না কেন, চিরতরে বুদ্ধি যখন স্তব্ধ হয়ে যায়, তখন **বুদ্ধিই টের পায় যে তার বুদ্ধিই তাকে বুদ্ধিহীন করে জন্মের মত ছেড়ে গেল**।

মহাজাগতিক রশ্মি মানুষের অণুকে ধ্বংস করে দিচ্ছে, এ কথার মানে এ নয় যে, অণুগুলো একেবরেই ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। অণুগুলো জৈব দেহকে দৈনন্দিন জীবনে ক্রিয়াশীল রাখতে এবং উদ্দীপনাশীলতাকে আর সহায়তা করতে পারছে না, দেহ নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে- দিনে দিনে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এই যে মহাজাগতিক রশ্মি মানুষের অনবরত এত সর্বনাশ করে চলছে, মহাক্ষতি হচ্ছে জীবনের কিন্তু তা আমরা মোটেই টের পাইনে, আমাদের জ্ঞান এবং বোধশক্তির অলক্ষ্যেই তো এ মহা ক্ষতিকর ঘটনা ঘটে।

দৈনন্দিন জীবনে রোজ ভোরে উঠে দিনকে দিনের মত ঠেকে, রাতকে রাতের মত মনে হয়। প্রিয়জনকে তেমনিই স্বাভাবিক দেখি, তেমনিই জীবন বাস্তব সত্য, ক্ষতিহীন, আনন্দময়, স্বাভাবিকই মনে হয়। কিন্তু এই স্বাভাবিক ভেতর দিয়ে অতি অলক্ষ্যে মহা

সর্বনাশ ঘটে চলেছে। মানুষ যদি অনুধাবন করতে পারতো বাস্তবে প্রতি সেকেন্ডে সেকেন্ডে তার মৃত্যু হয়ে যাচ্ছে, এ সংসার তার কাছে অসার হয়ে উঠতো। বিজ্ঞানীরা অনেক অনুসন্ধান করে অনেক প্রাণান্ত চেষ্টা করেও কিছুতেই ঠাউর করতে পারে নি-এই মহাজাগতিক রশ্মি-এই মারাত্মক আত্মঘাতি আলোটি কোথা থেকে আসে, কোথায় এর উৎস কি বা কে এই রশ্মিকে দুনিয়ার বুকে অনবরত ফুঁকে দিচ্ছে। দর্শন বলে প্রতিটি ঘটনার পেছনে একটি কারণ আছে। বিনা কারণে ঘটনা ঘটে না, লোকেই বলে বিনা বাতাসে গাং নড়ে না।

মহাজাগতিক রশ্মির গোড়া কোথায়, উৎস কোথায়, কে এর স্রষ্টা এবং কি কারণে কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এর সৃষ্টি। কেউ বলবে এমনি। **এমনি কথাটি হচ্ছে নির্বোধের কথা অথবা জ্ঞানের নাগালের বাইরের কথা, অজ্ঞতার কথা**। কারণ বিশ্বে কোন সৃষ্টিই এমনি নেই। প্রতিটি সৃষ্টির পেছনেই উদ্দেশ্য আছে, আমরা যারা বুঝিনা তারাই 'এমনি' বলে নিরব থাকি এবং নিজেকে ফাঁকি দিয়ে স্বস্তি পাই। মহাজাগতিক রশ্মির সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে সিদ্ধান্ত পৌঁছতে পারি যে, জড় জগতের অতি সূক্ষ্ম উপাদান পরমাণুকে ধ্বংস করার জন্য অমোঘ অস্ত্র রয়েছে মহাজাগতিক রশ্মির। কোন অজানা, কোন সুদূর দেশ থেকে এই রশ্মি আমাদের প্রিয়তম দেহকে ধ্বংস করে দিচ্ছে অথচ আমরা কোন ব্যাথা বুঝিনা, অনুভব করতে পারিনা। এমন যদি হত এই **রশ্মিটা দেহের ভেতরে ঢুকে একটা বিষাক্ত সাপের মত দংশন করতো পরমাণুগুলোকে, তাহলে কলিজার ভেতরের পরমাণুগুলোতে কল্পনাতীত যন্ত্রণা হতে থাকতো এবং তার কোন চিকিৎসক বা চিকিৎসা না থাকতো এবং এ বিষক্রিয়া আচরণ চলতেই থাকতো, তাহলে কেমন হত**।

মানুষের মরণের পরে মানে জীবাত্মা তিরোহিত হবার পরে সে যখন পরামাণুতে রূপান্তরিত হবে তখন এই মহাজাগতিক রশ্মির মত আর একটা রশ্মি মানুষের অণুগুলোকে ধরে বসবে এবং জাগতিক রশ্মি যখন পরমাণুকে আক্রমণ করে ধ্বংস করে তখন পরমাণুর ধ্বংস হলেও আমরা টের পাইনা। কিন্তু মরণের পরে **মানুষের অণুগুলোকে আক্রমণ করবার জন্য কোন প্রকার রশ্মি বা অনুরূপ কিছু থাকা স্বাভাবিক**। কারণ বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক নিউটন বলেন, "প্রত্যেক ক্রিয়ারই সমান এবং বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে।" **মৃত্যু একটা মহা একশান** (Action) **সুতরাং মরণের সঙ্গে সঙ্গে একটা রিএকশান** (Re-action) **জীবনের উপরে হওয়াই বিজ্ঞানের মতে স্বাভাবিক**। চোখে না দেখলে অনেক কিছুই আমাদের বিশ্বাস হতে চায় না অথচ দৈনন্দিন জীবনে আমাদের চোখের সম্মুখে কত কিছুই না আমাদের সামনে রয়েছে অথচ আমরা তার কিছুই দেখিওনা বা উপলব্ধিও করতে পারিনা। বাতাসে গানের সুরে সুরে কত গায়ক গায়িকা গান গাচ্ছে। যন্ত্র সংগীতের ঝংকার বাতাসকে মুখরিত করছে অথচ

আমরা দেখিনা বা শুনিনা। একটা রেডিও থাকলেই ধরা পড়ে আমরা কত বধির।

একটা নর্তকী নৃত্য করে যাচ্ছে এবং তার দেহলতা আমাদের চেয়ে থাকা চোখের তারা ছুঁয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমরা কানার মত চেয়ে থাকি চারিদিকে কিছুই দেখতে পাইনে। একটা টেলিভিশন জুড়ে দিলেই বোঝা যেত জ্ঞানের বহর আমাদের যাই থাক, দিন কানা। বাতাস অদৃশ্য, তার চেয়ে বেশী অদৃশ্য হচ্ছে বাতাসের গান আর সুর। ঢাকা রেডিও সেন্টার থেকে পাঁচশ' মাইল দূরে যদি একটা রেডিও থাকে এবং সেন্টারে সুরের ঝংকার ভরা একটি ভাটিয়ালী সংগীত বাজতে থাকে ঠিক এ সময় ঢাকার আকাশের বুকে মেঘের ঘনঘটা হয়েও উঠে এবং হঠাৎ সাৎ করে একটা বিদ্যুৎ রেখা সাপের মত আঁকা বাঁকা হয়ে আকাশে পরিব্যাপ্ত হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে পাঁচশ' মাইল দূরের রেডিওর ভাটিয়ালী গান আর তার সুরের ঝংকার নিমেষে থেমে যায়। ঘড়ঘড় করতে করতে গানটা দারুণভাবে দংশিত হতে থাকে।

বিষাক্ত সাপ কাউকে দংশন করলে যেমন সে হুমড়ি খেয়ে পড়ে কুকাতে থাকে বিদ্যুৎ চমকানোর সঙ্গে সঙ্গে গানটাও এ রকম বিদ্যুৎ সাপের দংশন খেয়ে ঘর ঘর করতে থাকে। গানের যদি শক্তি আর ভাষা থাকতো চিৎকার করে রেডিও থেকে বের হয়ে সাপুড়ের বাড়ীতে ছুট দিত। মানুষ মরার পরে কবর বা শ্বশ্মানে বা যে কোন জায়গায় যে কোন ভাবেই থাকুক না কেন তার প্রাণকেন্দ্র পরমাণুগুলো সমস্ত অনুভূতি নিয়েই তাজা থাকবে। **মহাজাগতিক রশ্মির অনুরূপ বা বিদ্যুতের অনুরূপ একটা দৃশ্য বা অদৃশ্য শক্তি যদি মহাবিশ্বের যে কোন স্থানে দংশন করে তবে এ রেডিওর গানের দংশনের মত একটা মানুষের কোটি কোটি মানুষরূপী পরমাণুর প্রত্যেকটিকে নিদারুণভাবে দংশন করে দেবে। শুধু বেদনা প্রকাশের মুখ নেই বলে এই পরমাণুর মানুষগুলো আযাব প্রকাশ করতে পারবে না।**

প্রিয়তম স্বামীর ধূলি ধূসর মলিন পরমাণুগুলো বিধবা স্ত্রীর দেহে বুকে ধূলি হয়ে যখন লেগে থাকবে এবং সাপের কঠিন দংশনে জর্জরিত হয়ে আযাব ভোগ করতে থাকবে, স্ত্রী তখন হয়তো শুধু স্বামীর কবরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে অক্ষম অশ্রু ঝরাবে। কেউ কাউকে বুঝবে না কারুর বেদনা কেউ টের পাবে না।

প্রশ্ন হতে পারে সব মানুষের পরমাণু তো এক রকম নয়। সবাইতো এক রকম শাস্তি পাবার উপযুক্ত নয়। কিন্তু মনে করি কোন অদৃশ্য সাপ দংশন করলে সব রকম মানুষই কি একই সাথে কামড় খাবে। আসলে ঘটনা হবে সহজ। লৌহচুর্ণ, চাউলচুর্ণ, চিনি, আটা ইত্যাদি যদি এক পাত্রে মিশিয়ে রাখা যায় এবং একটা চুম্বকের শলাকা দিয়ে তা নড়াচড়া করানো যায় তবে শুধু লৌহের চুর্ণগুলোই চুম্বকের স্পর্শে আসবে অন্যান্য পদার্থ আসবে না। **যে সব মানুষ দুনিয়ায় পাপের কাজ করে তাদের দেহের উপরে তাদের ঐসব পাপের প্রতিফলন হয়ে যায়। মনে করি তাদের পরমাণু লৌহের চুর্ণের মত গুণ সম্পন্ন হয়। অদৃশ্য সাপ যখন দংশন করবে পাপ পংকিল মানুষের উত্তপ্ত পরমাণুগুলোই শুধু কামড় খাবে অন্য ধরণের পরমাণুর মানুষেরা মোটেই কামড় খাবে না। তারা ঐ সাপের দংশনের নাগালের ভেতরে আসবে না।** যেমন ঃ একজন দরবেশ আর একজন চোর পাশাপাশি ঘুমায়। দরবেশ ঘুমের ঘোরে মক্কা শরীফ তওয়াফ করা দেখে আর চোর দেখে পুলিশের হান্টারের গুতো খাওয়া। একই বিছানায় পাশাপাশি শোওয়া একজনের পাশে আল্লাহ্‌র ঘর, শান্তির ঘর আর একজনের পাশে আযাবের ঘর, জেলখানা আর পুলিশের হান্টারের গুঁতো।

মরণের পরেও দুনিয়ায় সু-কর্ম বা কু-কর্মের প্রভাব দেহ ও আত্মা এই উভয়ের উপর প্রতিফলিত হবে এবং সেই বিভিন্ন ধরনের কর্মের ভিন্নমুখী তাছিরে একজনের শাস্তি হবে অন্যজনের স্বস্তি থাকবে। একজনের উত্তপ্ত দেহ পরমাণু সাপের দংশনের উপযুক্ত হবে, অন্যজনের পরমাণু মানুষটি নিরবে ঘুমিয়ে থাকবে মরণের পরও দুনিয়ার কার্যাবলীর প্রভাব দেহে ও আত্মায় থেকে যাবে। মনস্তত্ত্ববিদগণ পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখে মন্তব্য করেছেন, মানুষের মনের প্রভাবে দেহ প্রভাবান্বিত হয় এবং ঐ প্রভাব অনুযায়ী তার মেজাজের বহিঃপ্রকাশ হয়। কর্মের প্রভাব তার আত্মার উপরে এবং দেহের উপরে প্রতিফলিত হয়। আত্মার ধর্ম হচ্ছে অভিজ্ঞতা অর্জন করা এবং ইন্দ্রিয় দিয়ে মানুষ যে অভিজ্ঞতা অর্জন করে তাই তার আত্মাকে শান্তি ও স্বস্তির লায়েক করে তোলে।

এভাবে মানুষের দৈনন্দিন কর্মধারাই আত্মাকে সুস্থ বা ক্লিষ্ট করার মূল বাহন হিসেবে অলক্ষ্যভাবে কাজ করে যায়। মানুষের আত্মা যখন অসুস্থ হয়, আত্মা উত্তপ্ত হয়। এই উত্তাপ মনের উপরে প্রতিবিম্বিত হয়ে দেহের অণু পরমাণুতে দারুণভাবে প্রভাব বিস্তার করে। যেমন কোন আসামীকে কোন পুলিশ যদি অতর্কিতে ধরতে আসে তখন তার আত্মা কি নিদারুণ ভাবেইনা ভীত হয়। চোরের কলিজা কাঁপতে থাকে ও পুরুষাঙ্গ ভয়ে ছোট হয়ে যায়, মাথা আগুনের মত হয়ে যায়, হাত পা নিশ্চল হয়ে আসে। বাড়ীতে মধ্য রাতে ডাকাত পড়লে কেমন হয়। অনেকে ভয়ে জ্ঞান হারা হয়ে পড়ে যায়। অনুরূপভাবে অনেক খুনী লোক খুন করে আবোল তাবোল হয়ে যায়। বিবেক নষ্ট হয়ে অবশেষে পাগল হয়ে যায়। কেবলই দুঃস্বপ্ন দেখে। এই রকম বিভিন্ন ধরনের দুষ্কর্মের প্রভাব অনুযায়ী দেহের পরমাণুগুলোও উত্তপ্ত হবে এই বিভিন্ন ধরনের উত্তপ্ত পরমাণু মানুষগুলোর বিভিন্ন ধরনের লঘু বা গুরু আযাব হতে থাকবে। এ ধরনের কথা যারা বিশ্বাস করে না তাদেরকে বিশ্বাস করাবার কারোর কোন প্রয়োজন নেই, আমারও নেই। কিন্তু ভেবে দেখার জন্য আলোচনা করা হচ্ছে। **বিশ্বাস হচ্ছে পাকা তালের মত গোল ও রসাল ছোবড়াযুক্তও বটে। কেউ রস পায়, কেউ তালের গোলা পায়, কেউ ছোবড়া কামড়ে কামড়ে হুমড়ি খেয়ে থাকে। তাই বলা যায়, যার যেমন বোঝ ঃ দাড়ী চাচে রাখে**

মোচ। তবে বোনের ষাট বছরেও দাড়ি গজায় না। ভাইয়ের ষোল বছরেই দাড়ি উঠে। অর্থাৎ স্রষ্টার বিধান যেমন নারীর মুখে দাড়ি না দেখা। পুরুষের মুখে দাড়ি দেখতে চান তাই ষোলতেই দাড়ি আর ষাটেও দাড়িহীনা নারী। অবশ্য ব্যতিক্রম আছে। ছাগল ভেড়ার চিন্তা নেই, তাই সে অন্যের খাদ্য। যে মানুষ হয়েও কিছু ভাবনা ভাবে না, সে শুধু ঐ রকম কবরের খাদ্যই হবে । পরিত্রাণের পাত্র সে হতে পারবে না। মরণ বিজয়ী হবে না।

তার বল্গাহারা পলাতক চিন্তা ধারায় ভেসে সে একদিন অনন্তের সুরধ্বনিতে মিশে মিশে বিস্তৃতির জলধিতে বিলীন হয়ে যাবে। যে বিশ্বাস করে ঠকেছে তার শান্ত্বনা আছে, যে অবিশ্বাস করেছে তার অনুতাপ ছাড়া আর কিছুই নেই। দুষ্কর্মে অনুতপ্ত আত্মার যদি মরণের পরে কোন হিসেব পাতি না থাকে, কোন শাস্তি না থাকে তবে ভাল, কিন্তু যদি কোন শাস্তি বা অসংশোধনীয় দুঃখ থাকে তবে মরণের পাতা তো আর উল্টিয়ে দুনিয়ায় সংশোধনের জন্য ফিরিয়ে আনা যাবে না। নিজের মনের বিশ্বাসে প্রমাণহীন পরীক্ষাহীনভাবে এত বড় একটা মারাত্মক ঝুঁকি নিয়ে কি দুনিয়া থেকে চির বিদায় নিয়ে কবরে যাওয়া উচিত ?

হাদিস শরীফে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, কৃপণ ব্যক্তিকে বিষধর সাপ বুকে কামড়াবে এবং কিয়ামত পর্যন্ত মুহূর্তের জন্য দংশন বন্ধ হবে না। মরণের পরে মানুষ যখন পরমাণু মানুষ হয়ে যাবে তখন সাপটা আরও যুৎসই করে কামড়াতে পারবে। জীবিত মানুষের যে কোন অঙ্গে সাপ যদি দংশন করে তবে অন্যান্য অঙ্গে বিষক্রিয়া হতে সময় লাগে কেননা রক্ত চলাচলের সঙ্গে বিষের ক্রিয়া নির্ভরশীল থাকে। কিন্তু পরমাণুর ভেতরে সম্পূর্ণ মানুষটা অতি সংক্ষিপ্ত হয়ে একটা স্থানে কেন্দ্রীভূতভাবে থাকার ফলে সাপ যখন দংশন করবে চোখের নিমিষে সম্পূর্ণ দেহে হলাহলের তীব্র ক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে। এবং সম্পূর্ণ অঙ্গে একই সঙ্গে কামড় লাগবে।

হাদিস শরীফে আরো বলা হয়েছে, কিয়ামত পর্যন্ত মুহূর্তের জন্যও এ দংশন বন্ধ হবে না। মহাজাগতিক রশ্মি নিরবচ্ছিন্নভাবে মানুষকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। একটি মুহূর্তের জ ন্য সে পরমাণুকে দংশন থেকে বিরত নেই। মাঝে মধ্যে এই রশ্মিটা তো একটু জিরিয়ে নিতে পারে বা এক আধ কাপ চা, পানি খেয়েও একটু দম নিয়ে নিতে পারে। মহাবিশ্বের সমগ্র সত্ত্বাকে আমরা যা পেয়েছি যেমন করে পেয়েছি এবং যত সংখ্যায় বা দোষে গুণে পেয়েছি এর বাইরে আরও কিছু যে নেই বা এদেরকে অন্যরূপে বা অন্যভাবে যে আর পাওয়া যাবেনা তা কি সত্যিই সত্য কথা।

সকল প্রকার সৃষ্টি কি সৃষ্টি ধর্মের, সৃষ্টি স্বভাবের ইতিপ্রাপ্ত হয়েছে। ধ্বংসাত্মক সৃষ্টি কি

আর নেই বা হতে পারেনা? আরও এমন মারাত্মক রশ্মি যা সর্পাকারে পরমাণুকে ক্ষতি সাধন করতে পারে না? তাকে দংশন করতে পারে না? বিজ্ঞানের কি তৃতীয় বন্ধনী শেষ হয়ে গেছে? বিজ্ঞান কি বলে? বিজ্ঞানীর ভাষায় বিজ্ঞানের উন্নতির শেষ নেই। আজকের সত্য থিওরি কালকে বাতিল হয়ে যাচ্ছে। অবশ্য কত কত থিওরি স্থির সিদ্ধান্ত বলে মেনে নেয়া হয়েছে, যেমন গতি সৃষ্টি করে না দিলে জড় পদার্থ গতিশীল হয় না। দু'চারটে থিওরি স্থির সিদ্ধান্ত বলে মেনে নিলেও হাজার হাজার থিওরি আজও ভবিষ্যতের অনুসিদ্ধান্তের অপেক্ষা করছে। এভাবে কত সীমাহীন আবিষ্কারের সম্ভাবনা যে রয়েছে আজকের বৈজ্ঞানিকরা তা ভাবতেও পারছে না।

কবরের সাপটা ঠিক একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাপার। পরমাণু মানুষকে একটা অলক্ষ্য সাপ নির্ঘাতভাবে দংশন করে এবং মানুষ মরণে ধূলি হয়েই যাক আর পানিতে মিশে সাগরেই তলিয়ে যাক, এ সাপের দংশন জ্বালা থেকে দংশন খাওয়ার উপযুক্ত পরমাণু মানুষগুলো কোন ভাবেই রেহাই পাবে না। **স্থুল চোখ আর মোটা জ্ঞান দিয়ে স্থুল ভাবনা ভেবে সূক্ষ্মকে বোঝা যাবে না। ধান, পাট, আর সরিষা মাপার মোটা বাটখারায় কোনদিন অণুর ওজন মাপা যাবে না। পেরেক দিয়ে জ্বরের ওষুধ ইনজেকশন করা যাবে না।**

দৈহিক স্থুল জগতের বাইরে, ইন্দ্রিয়লব্ধ ত্রুটিসম্পন্ন জগতের বাইরে অন্য একটি সূক্ষ্ম জগতে আছে যেখানে জ্ঞান অচল, অভিজ্ঞতা সচল। ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান অন্ধ এবং ত্রুটিপূর্ণ ইন্দ্রিয় গোলামের মত। ইহা মালিককে অনেক ক্ষেত্রেই ভুল তথ্য পরিবেশন করে। যেমন অন্ধকারে চোখে রশি দেখে সাপ বলে জ্ঞানকে ধরিয়ে দিয়ে প্রাণ চমকিয়ে হার্টের ব্যাধি ধরিয়ে সর্বনাশ করে দিতে পারে।

সাধনালব্ধ আত্মিক জ্ঞান যে একটা গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান, ইন্দ্রিয়লব্ধ বিচ্যুতি সম্পন্ন জ্ঞান দিয়ে যারা এ কথা মানতে চায়না বা মানেই না তারা নিশ্চয়ই জানেই না আসলে যা সত্যিকারে জানার প্রয়োজন ছিল। ছারপোকার জ্ঞান রক্ত চোষাতে যতটুকু প্রয়োজন তাই। অধিকাংশ ক্ষুদে জ্ঞানীর জন্য ছারপোকার নীতি। জন্মান্ধকে কোন দিনও ভোরের সোনালী আকাশের সৌন্দর্য বোঝানো যাবে না। মানুষ সম্বন্ধে মানুষের ধারণা কতটুকু। বিশ্বে সবার উপরে অত্যাশ্চর্য্য সৃষ্টি হচ্ছে মানুষ। অনন্ত সম্ভাবনাশীল এ মানুষ।

মানুষের মাথাটায় এত ধারণ ক্ষমতা আছে যা বিশ্বের কোন সৃষ্টির নেই। যারা শুধু দৈহিক শক্তি বিশ্বাস করে দৈহিক জ্ঞান ইন্দ্রিয় লব্ধ জ্ঞানে যারা বিশ্বাসী তারাই আসলে নিজেকে অবিশ্বাস করে, সম্পূর্ণ না হলেও অন্তত আংশিক অবশ্যই। কেননা দৈহিক জ্ঞান মাপের বস্তু সামগ্রি হচ্ছে মাথা আর তার গুণাবলী। সেই বস্তু মাথার অনুশীলন করে যে মানুষ দেখতেই পাচ্ছে মানুষ কত উচ্চ মার্গে চড়তে চড়তে দুনিয়ার সীমানা পেরিয়ে,

চন্দ্রের নাকের উপর দিয়ে অবতরন করে, সেখানে মাথার বুদ্ধির ছাপ পুঁতে দিয়ে এল, সেই মানুষ কি ভুলেও একবার চিন্তা করে দেখে না তার মাথায় আরও কোন উচ্চতর ও জটিলতর সম্ভাবনা ছিল কিনা। তার জ্ঞানের বাইরে, আবিষ্কারের ও আওতার বাইরে এখনও অনেক অনেক কিছুই রয়ে গেছে। সর্বপ্রকার জ্ঞানই জ্ঞান দিয়ে জ্ঞান করা যাবে না। প্রসব ব্যথা, সাপের দংশন জ্বালা, বিচ্ছেদ-বেদনা, মা-হবার ব্যথা ইত্যাদি কোনদিনই জ্ঞানে বা যুক্তিতে বা কোন মাপকাঠিতে ধরা পড়ে না।

মানুষের ভেতরে আর একটা মানুষ আছে সেই এসব অনুমান গোচর করে। মরণের পরের অধ্যায়টা বা কবরের শাস্তি বা স্বস্তি ঠিক এমন একটা ইন্দ্রিয় লব্ধ জ্ঞান বহির্ভুত ব্যাপার যা বিশেষ এক প্রকার চেষ্টা এবং অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই আত্মিক জগতে ধরা পরবে। জ্ঞানে ধরা পরবে না। **পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বাইরে আরও একটি ইন্দ্রিয় মানুষের আছে যা অতি সূক্ষ্মতম বা ইন্দ্রিয় লব্ধ বহির্ভুত। যা শুধু সাধনার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়। এই সাধনা লব্ধ জ্ঞান ইন্দ্রিয় আয়নায় এমন সব অভূতপূর্ব জ্ঞানের প্রতিচ্ছবি ধরা পড়ে যা মানুষ ইন্দ্রিয় লব্ধ জ্ঞান দিয়ে কোন দিনই অবলোকন করতে পারে না।**

যেমন ঃ এই বইটা পড়তে পড়তে যদি কেউ ঢাকার সদর ঘাট কল্পনা করে। সদর ঘাট কল্পনা করলে এ কল্পনা শুধু কল্পনাই থাকবে। বাস্তবে সদর ঘাট দেখা যাবে না। সদর ঘাটে অজস্র লোকজনের বিপুল ভিড়, যানবাহনের দারুণ হুড়োহুড়ি ইত্যাদি কল্পনায় ভেসে উঠবে। এই যে কল্পনায় সদর ঘাটের এক হল্লোড়ের ছবি সে কল্পনা করছে কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে না, যদি এমন হত সদর ঘাট কল্পনা করার সঙ্গে সঙ্গে সত্যিই বাস্তবে সদর ঘাটের পূর্ণ ছবিটা ঐখানে দাঁড়িয়ে দেখলে স্বচক্ষে যা এবং যে ভাবে দেখা যেত দূরে থেকে কল্পনা করলেও সঙ্গে সঙ্গে ঐ রকম বাস্তবে ফুটে উঠতো তাহলে কেমন হত?

কল্পনাকে বাস্তবে চোখে দেখা যায় কেমন করে বিজ্ঞান আজও তা জানে না। বিজ্ঞান শিশু। বিজ্ঞানের আজও দুধের দাঁত পড়েনি, বিজ্ঞান ভাংগা ভাংগা ভাষায় দু'একটা আধো আধো কথা বলতে কেবল শিখেছে। বিজ্ঞান শুধু বুদ্ধিতে বিশ্বাস করে, ইন্দ্রিয়লব্ধ ত্রুটিময় জ্ঞানে বিশ্বাস করে, আছাড় খাওয়ায় বিশ্বাস করে। বিজ্ঞান সম্বন্ধে এত বড় রূঢ় মন্তব্য করা আমার ধৃষ্টতা তা জানি কিন্তু **যে মাথা খাটিয়ে বিজ্ঞানের মাথা পাওয়া যায় সে জটিল মাথাটা যিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁর মাথাটা কতইনা জটিলতম হতে পারে**। তিনি ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের বাইরে আরেকটি জ্ঞানের উল্লেখ করে গোটা মানব জাতিকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেছেন ঃ

ওয়া আল্লামনাহু মিল্লাদুন্না ইল্‌মা- আল-কুর'আন

"এবং আমি মানুষকে দিয়েছি ইন্দ্রিয় বহির্ভুত অতিন্দ্রিয় জগতের একটা গোপন জ্ঞান (যা যুক্তি দিয়ে উপলব্ধি করা যাবেনা।)"

সেটা সবার উপরের জ্ঞান। সবার উপরে তথা যা শুধু সাধনায় ধরা পড়বে। এই জন্যে বলা হয় **যাকে তোমরা জ্ঞান বল সে-তো জ্ঞানের অত্যন্ত প্রাথমিক হাতে খড়ি। আসলে জ্ঞানইতো হচ্ছে ধ্যানে, সুতরাং জ্ঞান জ্ঞান খ্যান খ্যান না করে ধ্যান করতে শেখ**। উপরোক্ত মহাবাণীতে একটা নতুন জ্ঞান, সম্পূর্ণ একটা অভিনব জ্ঞানের কথা, বিদ্যার কথা, যা ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান দিয়ে উপলব্ধি করা যাবে না বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অবিশ্বাসী জড়বাদী হৃদয় কি কোনদিন কোন কালে দু'চার ঘন্টার জন্য দয়া করে এ পরীক্ষা করে দেখেছিলেন কথাটা সত্য না মিথ্যা? আপনি যা ভাবেন তাই যে শুধু সত্য অন্য কোন সত্য আর সত্য নয়, এটা কি মানুষের কথা না জন্তুর বিবেচনা?

কবরের আযাব চোখে দেখা যায়

মরণের পরে কর্ম অনুযায়ী কবরে আযাব বা শাস্তি হয়। যে সব জড়বাদীরা বা তার্কিকরা একথা অবিশ্বাস করে তাদের সম্বন্ধে আগেই বলা হয়েছে যে, সব সমস্যার সমাধান জ্ঞান খাটিয়ে সমাধান করা যায় না বা যুক্তিতে সব কিছু ধরা পড়ে না। কোন সমস্যার সমাধান করতে সে সমস্যা যে ভাবে সমাধান চায় সে ভাবেই তাকে সমাধান করতে হবে। বুদ্ধি থিওরির গুলী মেরে দিয়ে তাকে সমাধান করা যাবে না।

অধিকাংশ মানুষের স্বভাব হচ্ছে নিজে যা বুঝে তাই সে সবার উপরে বড় মনে করে এবং শুধু তাই নয় এই কোনঠাসা বুঝসুঝ নিয়ে সে নিজেই একজন জ্ঞানী মনে করে, বিস্তর অজানা অথচ ধ্রুব সত্যকে অস্বীকার করে বাহাছ (ডিবেট) শুরু করে দেয়।

তাইতো জ্ঞানীরা বলেন, যে বলে আমি অনেক কিছুই জানি আসলে সে কিছুই জানে না এবং **যে বলে আমি কিছু জানিনা সেই হচ্ছে জ্ঞানী কারণ সে অনেক অজানা যে বিশ্বের বুকে রয়েছে এবং অজস্র বিদ্যা রয়েছে তা সে জানে না, সে অনেক জানতে গিয়ে একথা উপলব্ধি করেছে বলেই সে বলে আমি জানিনা**। অর্থাৎ বিশ্বের সবার উপরে জ্ঞানী লোকেরও জ্ঞানের বাইরে অনেক কিছুই আছে, যা অন্যে জানে, যা একজন জানে অন্যজন জানেনা এবং একথা যে মানেনা সে কূপমন্ডুক সে আত্মকেন্দ্রীক। সে নিজেকেই শুধু মানে অন্যকে মানে না।

এক প্রকার সত্যের চেয়ে অন্য প্রকার সত্য, যে সত্য, যদিও সর্বক্ষেত্রে সত্য নয় কিন্তু বহুক্ষেত্রেই সত্য হতে পারে একথা সত্য অস্বীকারকারী একগুয়ে লোকের সত্যের চেয়েও বড় সত্য। পেটের ভেতরের তীব্র ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হয়ে যদি কেউ এক থালা ভাত পেটের চামড়ার উপরে জাম করে বেঁধে রাখে এবং যুক্তি করে বলে যে, পেটের উপরেই তো একবারে খাদ্যের বোঝা চাপানো আছে তবে কেন ক্ষুধা মিটবেনা। এটাকি একটা জ্ঞান সম্মত কথা হলো?

পেটটা বেজায় রকম গন্ডগোল করছে পরিষ্কার হচ্ছে না তা বলে কাপড় কাচা সাবান যদি নাভীর উপর পালিশ করে মালিশ করা যায় অথবা সাবান গোটা তিনেক খাওয়া যায় তবে আরও বিপরীত ফল হবে। আখেরাতের ব্যাপারটা ঠিক এমনি। কবরের আযাব সত্য কিনা তা যুক্তি দিয়ে জ্ঞান খাটিয়ে কিছুতেই সম্যক ধরা পড়বে না। হয়তো আঁচ করা যাবে। সম্পূর্ণ বুঝা যাবে না।

যে সমস্যা সমাধানে, সমস্যা যেভাবে সমাধান চায় তা-ই করতে হবে এবং তা করতে হবে যুক্তিহীনভাবে শিশুর মত। যেমন ঃ এক খন্ড খাঁটি চুম্বক লৌহ কিনতে হলে বিলেত পাশের সার্টিফিকেট ওতে ঠেকালে বা একটা ভাল চমচম মিষ্টি বা বিজ্ঞানীর মাথা ওতে ঠেকিয়ে ঘষে পরীক্ষা করলেও কখনও চুম্বক খাঁটি বা অখাঁটি পরীক্ষা করা যাবেনা। চুম্বক পরীক্ষা করতে হলে ওর যথার্থতা পরীক্ষা করে কিনতে হলে নিশ্চয়ই ও যা দিয়ে পরীক্ষায় সত্য বলে প্রমাণিত হতে পারে তা-ই দিয়ে ওকে পরীক্ষা করতে হবে। একটি লোহার হালকা টুকরা দিয়ে পরীক্ষা করা ছাড়া বিশ্বের যে কোন বুদ্ধি শুদ্ধি বা ডিগ্রী দিয়ে ওকে পরীক্ষা করা যায় না।

ঠিক কবরের আযাবও এমনি একটা ব্যাপার যা কোন জ্ঞান বিজ্ঞানের থিওরি খাটিয়ে যা অযথা যুক্তি তর্ক দিয়ে পূর্ণ ঠাউর করা যাবেনা এবং এ ব্যাপারে গা ধাক্কিয়ে যুক্তির গুলি মেরে কবরের শাস্তি বা স্বস্তি উপলব্ধি হবে না।

প্রতিটি জিনিসের একটা নিজস্ব ধর্ম আছে। তার ধর্মের রীতি নীতি দিয়ে তাকে আবিষ্কার করতে হবে। পানিকে যদি দুনিয়ার শক্তিশালী কোন তলোয়ার বা তীক্ষ্ণ ধারালো কোন কিছু দিয়ে কেটে দু'ভাগ করতে চাইলে, সারা জীবন সাধনা করলেও তা কিছুতেই সম্ভব নয়। পানি দু'ভাগ করতে চাইলে বা তাকে বুঝতে হলে, তাকে আবিষ্কার করতে হলে-বিশেষ নিয়মে ধারাবাহিক প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখলে পানির মৌলিক পদার্থে যথাক্রমে-অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনে আপনা-আপনি বিভক্ত হয়ে পড়বে। পুনরায় উক্ত গ্যাসদ্বয় হতে পানিতে ফিরে পেতে হলে, অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের অনুপাত ঠিক রেখে বিদ্যুতের সাহায্য নিয়ে আবারও বিশেষ ব্যবস্থাধীনে ধারাবাহিকভাবে নিয়ম মাফিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পানি মিলবে। যদি নিয়ম, পদ্ধতি ও ধারাবাহিকতার মাঝে কোন ত্রুটি হয় পানিকে কোন দিন পৃথক করা যাবে না বা ফিরে পাওয়া যাবে না। অনুরূপভাবে মানুষের কবরের আযাব বা শাস্তি বুঝতে হলে একটা ধারা বা নিয়ম আছে সেই নিয়মে কিছু দিন খাটা খাটুনি করলে উপলব্ধি করা যাবে যে মানুষের মরণের পরে কি ঘটে।

আগেই আলোচনা করা হয়েছে, কবর বলতে কিছু নেই এবং মানুষের মরণ বলতেও কিছু নেই, লেখার সুবিধার জন্য মরণ বা কবর ইত্যাদি লেখা হয়েছে। **মানুষের মরণ অর্থ দেহ থেকে জীবাত্মা তিরোহিত হওয়া, মানুষ কোটি কোটি পরমাণুতে পরিণত হয়ে যাওয়া। প্রতিটি পরমাণু কবরে একটি করে পরমাণু মানুষ থাকে।**

চোখে দেখা যাবেনা বা যায় না বলে কোন অদৃশ্য সত্ত্বার অস্তিত্ব বেমালুম অস্বীকার করলে মুর্খতাই হবে, খালি চোখে শূন্য মাঠের দিকে তাকালে বা ঘরের ভেতরে তাকালে কোন গান বা ছবি নজরে পড়ে না তাই বলে বাতাসে গান বা টেলিভিশনের ছবিগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে এটা কি অস্বীকার করা যাবে। কিন্তু শূন্য স্থানে ছবি থাকতে পারে, চোখের সামনে একেবারে চোখের মনি ছুঁয়ে একটা নারী মূর্তি নেচে নেচে বিরাজমান থাকতে পারে, কে-ই-বা আগে বিশ্বাস করতো। এখন একটা রেডিও বা টেলিভিশন থাকলেই শূন্যের গান বা ছবি ধরতে পারা যাবে।

কিন্তু এটাই খুব আশ্চর্যের বিষয় যে এই শূন্যের ভেতরে গান আছে একথা কেউ কি কোন কালে বিশ্বাস করত? কিন্তু এক শ্রেণীর মানুষ কঠোর সাধনা করে নাই'র ভেতরে আছে'র কল্পনা করে, নাই যে নাই নয়, নাইর ভেতরেও যে 'আছে' আছে, তার প্রমাণ করে দিয়েছেন এবং তারা সাধনা না করে জ্ঞান জ্ঞান খ্যান খ্যান করেননি। ধ্যান করেছিলেন অর্থাৎ হাইপোথেসিস করে অগ্রসর হয়েছিলেন তারা বাতাসের ভেতরে গান থাকতে পারে বা পাঠানো যেতে পারে এই কল্পনাটা হয় নিজেরা করেছেন অথবা শুনে এর যথার্থতা পরীক্ষা করার জন্য কার্যক্ষেত্রে একনিষ্ঠ হয়ে নেমে পড়েছিলেন।

এতগুলো কথার অবতারণা করার আসল অর্থ এ নয় যে, মরণের পরে কবরের আযাব বলতে একটা মিথ্যা ভয় দেখিয়ে কাউকে কোনঠাসা করার প্রয়াস পাওয়া। আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে, আসলেই কবরের আযাব বা শাস্তি আছে এবং তা সরাসরি চোখে সরাসরি যুক্তিতে এক কাপ চা পান করার মত বা কিছু থিওরি টিওরির ফরমুলায় ফেলে একটা হিসাব পাতির নিরসন করার মত খুব সহজে এবং যেন তেন প্রকারেও বোঝা যাবেনা। মরণের পরে মানব জীবনের অধ্যায়টা বুঝতে হলে, কবরের আযাব আবিষ্কার করতে হলে ঐ পানি আবিষ্কারের মত একটা বিশেষ নিয়মে বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অগ্রসর হতে হবে।

অ, আ থেকে নজরুলের কবিতা বুঝতে যেমন ক্রমিক ধারা অনুযায়ী পড়ে যেতে হয়, এখানেও তাই করতে হবে। যে ধারাগুলো এই বইয়ের শেষে লিখে দেওয়া হয়েছে। আর একটা কথা না বললে হয়না লেলিন, স্ট্যালিন, মার্কস, হিগেল, ল্যামার্ক, ডেকার্ট, পাভলভ, কান্ট, ফ্রয়েড, মরগ্যান, আইনস্টাইন ইত্যাদি মনিষী মানুষেরা যা বলেছেন বা থিওরি দিয়েছেন জ্ঞানের অনুসারী হিসাবে সকলেই তা গ্রহণ করলেন, পরীক্ষা করে দেখলেন। বড় বড় মনিষীদের থিওরি পরীক্ষা করে সত্য কি মিথ্যা তা যাচাই করার যোগ্যতা অর্জন করতে আপনাকে কতদিন কঠোর শ্রম স্বীকার করতে হয়েছিল ? আশ্চর্যের বিষয় এই যে, **জ্ঞান অর্জন করতে জ্ঞানই জ্ঞানীকে ফাঁকি দিয়ে একমুখী করে যে রাখে ক্ষুদে জ্ঞানী তা টের না পেয়ে এক তরফা বিবেচনা করতে করতে একাই এক তরফার যে ত্রুটি তার স্বীকার হয়ে অন্ধত্বে এবং কূপমন্ডুকতায় ভুগে মরে।**

আইনস্টাইন, লেলিন, মার্কস ইত্যাদিরা যেমন থিওরি দিলেন, তারা যেমন মানুষ ছিলেন হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) একজন মানুষের নাম। তিনিও তো একজন যুগ স্রষ্টা মহামানুষ ছিলেন। বিভিন্ন মনিষীদেরকে যেমন মানুষ মনে করেন, তাদের মত তিনিও একজন মানুষ। তিনি নবী ছিলেন বিশ্বাস নাইবা করলেন, মানুষ হিসেবে তো তিনি বিশ্বজোড়া সবার উপরে একজন খ্যাতিসম্পন্ন মানুষ। সকল মানুষের দেয়া থিওরি এত দীর্ঘ দিন শ্রম স্বীকার করে, লেখাপড়া করে, গবেষণা করে, অন্ধ কোঠায় আটকে থেকে প্র্যাকটিক্যাল করে, পরীক্ষা করে দেখলেন- আর হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) এই যে একজন মহামানুষ যে থিওরিগুলো দিলেন জীবনে কোন দিনও তা একবার পরীক্ষা করে দেখলেন না? এক তরফা বিবেচনা কি ভাল? পক্ষপাতিত্ব কি শিক্ষার কথা? পরীক্ষায় না টিকলে তার কথা ফেলে দিলে অথবা তাকে মন্দ বললে ক্ষতি হত না।

তিনি বলেছেন, কবরের আযাব সত্য। আপনি কি এই ছোট অথচ মহা সমস্যাপূর্ণ থিওরিটি ভুলেও একবার পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখে এটা ভুল কি শুদ্ধ সঠিকভাবে সাব্যস্ত করে দেখেছেন? একজন এম. এস-সি. পাশ লোকের কথা বুঝতে কমপক্ষে আই. এস-সি. ক্লাস পর্যন্ত বার বছর শ্রম স্বীকার করতে হয়। হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) একটা মহাবিদ্যার স্পষ্ট মহা-থিওরি দিলেন। আপনি কতদিন পরিশ্রম করেছিলেন তাঁর মহা-থিওরিটা বুঝবার জন্য?

আল্লাহ্, রাসূল (সাঃ), কবরের আযাব এবং আখিরাত সত্য কিনা তার ফলিত প্রমাণ (Applied Proof)

মরণের পরে মিশে যাওয়া মানুষটার কিভাবে কবর আযাব হয়, কিভাবে অনন্তকাল একটা মানুষকে সাপে কামড়াবে, কিভাবে কবরে মুনকার-নাকির ফেরেস্তারা গুর্জ মারবে এবং সত্যিই জাহান্নাম বা দোযখ বলতে কিছু আছে কি না, বেহেশত সত্য কি না, রাসূল (সাঃ) কি সত্যিই নবী ছিলেন না কবি ছিলেন এবং সবার উপরে আল্লাহ্ বলতে একজন আছেন কিনা এ সব পরীক্ষায় আজই নেমে যান। এই বই টেবিলে সরিয়ে রাখুন। আপনার লেখাপড়ার স্থানটি যেমন নিরালাতে করেছিলেন, একটা চেয়ার একটা টেবিল দিয়ে সাজিয়েছিলেন, ঠিক এ বেলায়ও একটা নিরালা স্থান খুঁজে নিন। সেখানে কেউ যেন আপনাকে না দেখে। একটা পরিচ্ছন্ন বিছানা বিছিয়ে নিন। তারপর নিম্নের প্রক্রিয়ায় কাজ আরম্ভ করুন ঃ

চক্ষু বন্ধ করে বসুন। কপাল থেকে নাক বরাবর দৃষ্টি রাখুন এখন মন খুব স্থির করে মৃত্যুর ভাবনা ভাবুন। মনকে প্রশ্ন করুন মন তুমি মরবে কি না? মন উত্তর দেবে মরব। দ্বিতীয় বার প্রশ্ন করুন, মরে তুমি যাবে কোথায়? তোমাকে কি ঘরে রাখবে , না করবে? মন উত্তর দেবে, কবরে। তৃতীয় প্রশ্ন করুন, কবরে তোমার কে বান্ধব হবে? মন উত্তর দেবে, আল্লাহ্ ছাড়া কেউ বান্ধব নেই। এই কয়টা প্রশ্ন এবং উত্তর খুব নিবিড়ভাবে মনোনিবেশ সহকারে হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে হবে। এরপর একটা লোক মরণ থেকে কবরে যাওয়া পর্যন্ত যা যা ঘটে নিজের ওপরে খেয়ালে খেয়ালে ঘটিয়ে নেবেন। খুব নিবিড়ভাবে খেয়াল করবেন আমি এখন মরে গেলাম। আমাকে চার জন লোকে ধরাধরি করে দুয়ারে বের করে। এখন আমাকে গোসল দেয়। খেয়ালের নজরে দেখবেন গোসলের পানিটা দুয়ারের ওপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে যায়, আপনার অবুঝ সন্তানেরা সেই পানিতে খেলা করে। আপনার বিবি আপনার চেহারার দিকে তাকিয়ে আছে ফ্যাল ফ্যাল করে। চোখের পানিতে সে বুক ভিজিয়ে দিচ্ছে। আপনাকে এপিঠ ওপিঠ করে গোসল দেয়া হচ্ছে। এখন আপনার জন্য কাফনের কাপড় এনে পাশে রাখা হল। এখন আপনাকে কাফন দেয়া হচ্ছে। এখন কাফনে মুড়িয়ে আপনি দুয়ারে অসহায় হয়ে শুনে আছেন আসমানের দিকে মুখ করে। এখন আপনার বিধবা বিবি অঝোর নয়নে আপনার কাফনের দিকে চেয়ে কাঁদে। খুব নিবিড়ভাবে লক্ষ্য করে দেখবেন আপনার বিধবা বিবিকে হাতের চুড়ি বিহীন অবস্থায় দেখলে কেমন দেখা যায়। এসব কল্পনা করলে দেখবেন দেলটা (মন) নরম হবে, তখন নিম্নের সব অর্থ ভাল করে খেয়াল করে বলতে থাকবেন।

সবক
The Lesson

সবক করার নিয়ম

ভাল উৎপাদন পেতে হলে ভাল ভাবে জমি চাষ করে নিতে হয়, মরণের খেয়াল হচ্ছে আল্লাহ্র বাস্তব জ্ঞান (Practical) বা মা'রেফত অর্জনের জন্য জমি চাষতুল্য। হাদিস শরীফে আছে, "আকিছিরুজ জিক্‌রা হাদামুল লাজ্জাত"-তোমরা অধিক পরিমাণে স্বাদ বিনষ্টকারী মৃত্যুকে স্মরণ কর। আরও আছে, হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, যে ব্যাক্তি দিনে বিশ বার মরণকে স্মরণ করে, তার শহীদের চেয়েও বেশী নেকী হয় (বুখারী শরীফ)।

সবক আরম্ভ করার পূর্বে প্রথম দিন দু'রাকায়াত শোকরানা নামাজ আদায় করে আল্লাহ্র দরবারে যাবতীয় গুনাহ মাফ চেয়ে দো'য়া করবেন। মাবুদ এই গোলামকে আপনি কবুল করে নিন, এই তরিকার সমস্ত নেয়ামত এ গোলামের নছিব করুন। মাগ্‌রিবের ফরজ সুন্নত নামাজ আদায় করার পর, ছয় রাকায়াত আউয়াবিনের নামাজ আদায় করে তারপর শোকরানা নামাজ পড়বেন। শোকরানা নামাজের পরে পাঁচবার দরূদ শরীফ পড়ে মোনাজাত করবেন। তারপর একটা নিরালা স্থানে চক্ষু বন্ধ করে মন স্থির করে বসবেন। বসে নিম্নলিখিত কায়দায় মরণের খেয়াল করবেন।

চক্ষু বন্ধ করে কপাল থেকে নাক বরাবর দৃষ্টি রাখুন। এখন মন খুব স্থির করে মৃত্যুর ভাবনা ভাবুন। মনকে প্রশ্ন করুন, মন তুমি মরবে কি না? মন উত্তর দিবে, মরব। দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করুন, মরে তুমি যাবে কোথায়? তোমাকে কি ঘরে রাখবে, না কবরে? মন উত্তর দেবে, কবরে। তৃতীয় প্রশ্ন করুন, কবরে তোমার কে বান্ধব হবে? মন উত্তর দেবে, আল্লাহ্ বাদে কেহ বান্ধব নেই। এই কয়টা প্রশ্ন এবং উত্তর খুব নিবিড়ভাবে হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে হবে। এরপর একটা লোক মরণ থেকে কবরে যাওয়া পর্যন্ত যা যা ঘটে নিজের উপরে খেয়ালে খেয়ালে ঘটিয়ে নেবেন। খুব নিবিড়ভাবে খেয়াল করবেন, আমি এখন মরে গেলাম। আমাকে চারজন লোক ধরাধরি করে দুয়ারে এনে রাখে। এখন আমাকে গোসল দেয়। খেয়ালের নজরে দেখবেন, গোসলের পানি দুয়ারের উপর দিয়ে গড়িয়ে যায়, আপনার অবুঝ সন্তানেরা সেই পানিতে খেলা করে। আপনার বিবি আপনার চেহারার দিকে তাকিয়ে আছে ফ্যাল ফ্যাল করে, চোখের পানিতে সে বুক ভিজিয়ে দিচ্ছে। আপনাকে এপিঠ ওপিঠ করে গোসল দেয়া হচ্ছে। এবার আপনার জন্য কাফনের কাপড় এনে পাশে রাখা হল। এখন আপনাকে কাফন দেওয়া হচ্ছে। এখন কাফনে

মোড়ানো আপনি দুয়ারে অসহায়ভাবে শুয়ে আছেন আসমানের দিকে মুখ করে। এখন আপনার বিধবা বিবি আপনার দিকে চেয়ে অঝোরে কাঁদে। খুব নিবিড়ভাবে লক্ষ্য করে দেখবেন, আপনার বিধবা বিবিকে হাতের চুড়িবিহীন অবস্থায় দেখলে কেমন দেখা যায়। এসব কল্পনা করলে দেখবেন দেল (মন) নরম হবে।

সবকে বসার কায়দা

চারজানু হয়ে বসে বাম পায়ের কিমিয়াস রগকে ডান পায়ের বৃদ্ধা ও তৎসংলগ্ন আঙ্গুল দিয়ে খুব চেপে ধরবেন। বাম পায়ে হাটুর নীচের দিকে যে মোটা রগটা আছে, তাকে কিমিয়াস রগ বলে। এই রগ দিয়ে শয়তান চলাফেরা করে, ঘাড়ের নীচে গোল হাড়ে আশ্রয় নেয়। এই রগটা জোরে চেপে বসলে শয়তানী খেয়াল দূর হয়। এই রগটা চেপে বসলে জেকেরে তাড়াতাড়ি তাছির হয়। মেয়েলোক নামাজের আসনে বসে জিকির করবেন।

আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও সান্নিধ্য লাভের সবকসমূহ

প্রথম সবক

তারপর যে কোন দরূদ শরীফ পাঁচবার পড়বেন। এই সময় খেয়াল করবেন, রাসূলুল্লাহ্‌র (সাঃ) রওজা মোবারকের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর উপর দরূদ পড়ি। যদি পারেন নিম্নোক্ত দরূদ শরীফ পড়বেন

"আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা সাইয়্যেদেনা ওয়া নাবিয়েনা ওয়া শাফিয়েনা ওয়া হাবিবিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াআলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম।"

দরূদ শরীফ পাঁচবার পড়ার পর 'আসতাগফিরুল্লাহ' এগার বার পড়বেন। যদি পারেন নিম্নোক্ত আসতাগফিরুল্লাহ পড়বেন খেয়াল করবেন, আমি যাবতীয় গুণাহ্ হতে আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা চাই।

"আসতাগফিরুল্লা হাল্লাজি লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল কাইয়ুম ওয়া আতুবু ইলাইহে লা হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল্ আলিয়্যিল আজিম"

এরপর হাতে একটা তসবিহ্ নিয়ে পড়বেন

সোব্হানআল্লাহ্-	১০০ (একশত বার)
আলহামদুলিল্লাহ-	১০০ (একশত বার)
আল্লাহু আকবার-	১০০ (একশত বার)

এই সময় খেয়াল করবেন, আল্লাহ্ আমার দিকে চেয়ে আছেন, আমি আল্লাহ্‌র দিকে চেয়ে আছি। আমি আল্লাহ্‌কে দেখে ডাকি, আল্লাহ্ আমার ডাকের জবাব দিয়ে বলেন, বান্দা আমারে বুলাও ক্যা বা ডাক কেন? হাদীস শরীফে আছে, বান্দা একবার আল্লাহ্‌কে ডাক দিলে, তিনি দশবার জবাব দেন। এই তিন তসবিহ্ পড়ার সময় লফজ মানে খেয়াল না করে প্রতিবারই খেয়াল করবেন, আল্লাহ্ ডাকের জবাব দিয়ে বলেন, বান্দা আমারে বুলাও কেন বা কেন ডাক? এবং প্রতিবারই কানে আল্লাহ্‌র ঐ জবাব শুনতে চেষ্টা করবেন। একদিন ইন-শা-আল্লাহ্ দেলের কানে স্পষ্ট শুনতে পাবেন, আল্লাহ্ কেমন করে উত্তর দেন।

তারপর **'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'** ৫০০ (পাঁচশত বার)
দেলে দেলে মানে বা অর্থ খেয়াল করবেন, **"আল্লাহ্ বাদে কেহ মা'বুদ নাই"**।

"লা" শব্দ বলার সময় মুখখানা ডানদিকে ঘুরিয়ে ডান কাঁধের উপর নেবেন, ডান কাঁধের উপর হতে 'লা' শব্দ উঠাবেন, ইলাহা বলতে বলতে মাথাটা খাড়া রেখে বাম দিকে ঘুরিয়ে আনবেন, নাকটা যখন বাম দুধের বোটা বরাবর আসবে, বাম দুধের দুই আঙ্গুল নিচে আল্লাহ্‌র ঘর ক্বলব থাকে, তখন খাড়া মাথাকে 'ইল্লাল্লাহ্' বলে সজোরে ক্বলবে নিক্ষেপ করবেন যেন, 'ইল্লাল্লাহ্' গলায় না বেঁধে ক্বল্‌বের ভিতরে ঢুকে যায়। ইল্লাল্লাহ্ বলার সময় নাকটা ক্বল্‌ব পর্যন্ত নামাতে চেষ্টা করবেন, বুকটা বাঁকা করে নিচের দিকে নামাবেন। লক্ষ্য রাখবেন, 'ইল্লাল্লাহ্' যেন গলায় থেত্‌লিয়ে আটকিয়ে না যায়। মাথা খুব ঘন ঘন আছাড়-পিছাড় করবেন না শুধু উঠানামা করাবেন মাঝে মাঝে 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)' বলবেন। আর যদি সবকে এস্ক লেগে যায়, তবে একেবারে শেষে কয়েকবার বলবেন। পরে **পাঁচ বার দরূদ শরীফ** পড়ে মোনাজাত দেবেন। মাগরিব বাদ ছয় রাকাত আউয়াবিন নামাজ আদায় করে এই সবক করবেন, না পারলে এশা বাদ, না পারলে শোবার আগে কোন সময় ওজু ছাড়াও করতে পারবেন, ফজর বাদ আরেকবার এই সবক করে বেলা উঠলে ছয় রাকায়াত এশরাকের নামাজ আদায় করবেন। হাটতে, চলতে, তসবীহ্ ছাড়া, ওজু ছাড়া, আন্দাজে- অনুমানেও এ সবক আদায় করতে পারবেন।

এই সবকের নিম্নমানের তাছির (Result) এই হবে যে, দেল পরিবর্তন হয়ে যাবে অথবা চোখে পানি ঝরবে, লোকের সঙ্গে অযথা আলাপ করতে ইচ্ছে করবে না, গুণাহের কাজে মন যেতে চাইবে না পীরের জন্য মহব্বত বৃদ্ধি পাবে, তাকে দেখতে ইচ্ছে করবে তাঁর কথা শুনতে ভাল লাগবে আর আখেরাতের চিন্তা মনে ঢুকে যাবে। পুরুষেরা শব্দ করে এবং স্ত্রীলোকেরা নিম্ন স্বরে, নিজে কানে শুনে এভাবে জেকের করতে হবে।

প্রথম প্রথম এই সবক করতে গেলে উজান ঠেলতে হবে, লোকে সমালোচনা করবে। কিন্তু সেদিকে খেয়াল দেয়া নিস্প্রয়োজন, কারণ একের কবরে অন্যে যাবে না। সবকের সময়ে কু-খেয়াল অথবা সবকে তাছির না হলে, বামদিকে 'লা-হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল্ আলিয়্যিল আজিম' পড়ে থু থু করে শব্দ করতে হবে (থু থু ফেলার দরকার নেই)। সবকে তাছির না হলে অথবা সবক করতে মনে যদি না লয়, তবে জোর করে মাত্রা বাড়িয়ে সবক আদায় করতে হবে। জোর করে মিষ্টি খাওয়ালে কি মুখে মিঠা লাগে না? জোর করে ওষুধ খেলে কি বিমারি ভাল হয় না? আল্লাহ্‌র নাম যাতে মুখে না উঠে, তার জন্য শয়তান অনবরত পেছনে তো লেগেই আছে, একথা যেন মনে থাকে।

দ্বিতীয় সবক

নফি এছবাত বা বার তস্‌বির সবক

এই সবকে বসে প্রথমে চক্ষু বন্ধ করে কপাল থেকে নাক বরাবর দৃষ্টি রেখে প্রথম সবকের মত মরণের খেয়াল করবেন এবং মনকে বুঝিয়ে বলবেন যে, কত মানুষ কবরে গেল, তোমাকেও কবরে যেতে হবে! মরণের পরে অনন্তকালের জীবনে যার সঙ্গে থাকতে হবে, দুনিয়ায় বেঁচে থাকতে তাঁর সঙ্গে ভালবাসা করে না গেলে, অন্ধকার কবরে কি ভীষণ অবস্থার সৃষ্টি হবে! এইভাবে উত্তমরূপে মরণের খেয়াল করে পড়বেন ঃ

দরূদ শরীফ-	৫ (পাঁচ বার)
আসতাগফিরুল্লাহ-	১১ (এগার বার)
সোবহানআল্লাহ্-	১০০ (একশত বার)
আলহামদুলিল্লাহ্-	১০০ (একশত বার)
আল্লাহু আকবার-	১০০ (একশত বার)

এই তিন তসবিহ্ পড়ার সময় প্রত্যেকবারই খেয়াল করবেন, "আমি আল্লাহ্‌র দিকে চেয়ে আছি, আল্লাহ্ আমার দিকে চেয়ে আছেন। আমি আল্লাহ্‌কে দেখে ডাকি, আল্লাহ্ ডাকের জবাব দিয়া কয় (বলেন), বান্দা আমারে বুলাও ক্যা বা ডাক কেন"। যদি কোন সময় পূর্ণ একশো বার নাও বলতে পারেন, তবে 'সুবহানআল্লাহ্' তেত্রিশ, 'আল্‌হামদুলিল্লাহ্' তেত্রিশ, 'আল্লাহু আকবার' চৌত্রিশ বার বলবেন। কিন্তু হালকায়ে জিকিরের দিন পূর্ণ একশত বার করে বলতে হবে।

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ- ২০০ (দুইশত বার)

দেলে দেলে মানে বা অর্থ খেয়াল করবেন- **আল্লাহ্ বাদে কেহ মা'বুদ নাই**।

অথবা যদি কেহ পারেন, তবে নিম্নোক্ত খেয়াল করতে পারেনঃ

'লা মাকছুদা ইল্লাল্লাহ্-লা মাতলুবা ইল্লাল্লাহ্-লা মাহবুবা ইল্লাল্লাহ্-লা মাশুকা ইল্লাল্লাহ্' অথবা এইভাবে খেয়াল করতে পারেন, যখন "লা" শব্দ বলবেন তখন খেয়াল সাত তবক আসমানের উপরে নিয়ে দেখবেন, কোথাও আল্লাহ্ নেই সঙ্গে সঙ্গে ঐ খেয়াল জ মিনের দিকে আনবেন এবং হাজার হাজার মাইল জমিন সব ঘুরে আসবেন এবং খেয়ালের দৃষ্টিতে দেখবেন জমিনেও আল্লাহ্ নেই অথবা এইভাবে খেয়াল করতে পারেন "লা" শব্দ যখন বলবেন, সঙ্গে সঙ্গে খেয়াল করবেন, জমিন নেই, আসমান নেই, আমার শরীরও নেই, কিছুই নেই, শুধু আল্লাহ্ই আছেন।" এখন আল্লাহ্ কোথায় আছেন, হাদিস শরীফের মতে ক্বল্‌ব হল আল্লাহ্‌র আরশ সুতরাং এখন খেয়াল কল্‌বের দিকে নেবেন এবং একিনের চক্ষু দ্বারা ক্বল্‌বের দিকে নজর করলে দেখবেন, আমার ক্বল্‌বে আল্লাহ্ই

আছেন। অথবা অন্য রকম খেয়ালও করতে পারেন "বেহেশ্‌ত দোজখ আরশ কুরছী লওহ্ কলম সাত তবক আসমান জমিনে কোথাও আল্লাহ্ নেই, কিন্তু একিনের চক্ষু দিয়ে ক্বল্‌বের উপরে নজর করে দেখবেন, আল্লাহ্ আমার ক্বল্‌বেই আছেন। প্রথম শিক্ষার্থীদের জন্য এই সমস্ত খেয়াল না করা ভাল। তারা "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর" অর্থ খেয়াল করবেন, "আল্লাহ্ বাদে কেহ মা'বুদ নাই।" প্রথম সবকের নিয়ম অনুযায়ী লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবেন। তারপর-

ইল্লাল্লাহ্- ৪০০ (চারশত বার)

ইল্লাল্লাহ্‌র মানে খেয়াল করবেন, **"আমার ক্বলবে আল্লাহ্‌ই আছেন"**।

বাম দুধের দুই আঙ্গুল নিচে আল্লাহ্‌র ঘর ক্বলব থাকে, খাড়া মাথাকে 'ইল্লাল্লাহ্' বলে সজোরে ক্বলবে নিক্ষেপ করবেন যেন, 'ইল্লাল্লাহ্' গলায় না বেঁধে ক্বল্‌বের ভিতরে ঢুকে যায়। ইল্লাল্লাহ্ বলার সময় নাকটা ক্বল্‌ব পর্যন্ত নামাতে চেষ্টা করবেন, বুকটা বাঁকা করে নিচের দিকে নামাবেন। লক্ষ্য রাখবেন, 'ইল্লাল্লাহ্' যেন গলায় থেত্‌লিয়ে আটকিয়ে না যায়। আকায়েদের মাসআলা নিয়ে বেশী হুলাহুলি করবেন না, তাহলে সবকের আসল মর্ম বুঝতে পারবেন না। শুধু আকায়েদই হাসিল হবে, আল্লাহ্ হাসিল হবে না। কারন, যুক্তিতে তাকে পাওয়া যায় না, ভক্তি রসে অবগাহিত হয়ে তাঁকে পাওয়া যায়। এরপর

আল্লাহ্ আল্লাহ্- ছয়শতবার

'আল্লাহ্ আল্লাহ্' বলার সময় কপাল থেকে নাক বরাবর দৃষ্টি রাখবেন, এই দৃষ্টি যেন নড়াচড়া না হয় এবং খেয়াল করবেন, "আমি আল্লাহ্‌কে দেখে ডাকি, আল্লাহ্ আমার ডাকের জবাব দিয়ে বলেন, বান্দা আমাকে বুলাও ক্যা বা ডাক কেন?" এই ডাকের জবাব শুনার জন্য দেলের কান সজাগ রাখবেন এবং বিশ্বাস করবেন। হাদিস শরীফে আছে, আল্লাহ্ পাককে একবার ডাক দিলে, আল্লাহ্ পাক ১০ বার ডাকের জবাব দেন। পরে **৫ বার দরূদ শরীফ** পড়ে মোনাজাত করবেন।

উক্ত সবকের তাছির (Result)

১। জেকের করতে করতে কান্না আসে।
২। আল্লাহ্‌র নাম নেওয়ার জন্য মনে উদাসীন ভাব আসে।
৩। সুন্নতের তাবেদারী করতে মনে ইচ্ছা করে।
৪। শরীয়তের জন্য কুর'বান হতে মনে চায়।
৫। কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' নূরানী নকশায় রূহানী নজরে দেখা যায়।
৬। ক্বল্‌বের মধ্যে 'ইল্লাল্লাহ্‌র' নূরানী নকশা দেখা যায় এবং অন্তরের অন্তঃস্থল হতে কে যেন নিরবচ্ছিন্ন জেকের করে মা'লুম হয়। আর কোন কোন সময় মনে হয়, অনেক দূর হতে আল্লাহ্‌র জিকিরের শব্দ অজস্র ধারায় ভেসে আসে।
৭। কোন কোন সময় জিকির করতে করতে নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে যায়।

তৃতীয় সবক

হাব্‌সে দম

এই সবকে বসে মওতের খেয়াল করার পর, দ্বিতীয় সবক বা নফি এছবাতের সবকের অর্ধেক আদায় করবেন অর্থাৎ

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্- ১০০ (একশত বার)
ইল্লাল্লাহ্- ২০০ (দুইশত বার)
আল্লাহ্ আল্লাহ্- ৩০০ (তিনশত বার)

তারপর সবক বন্ধ করে দিয়ে, চুপ করে বসে খুব খেয়াল করে একটা লোক মরণ থেকে কবরে নিয়ে মাটি দিয়ে আসা পর্যন্ত যা যা ঘটে নিজের উপরে খুব খেয়ালে খেয়ালে চিন্তা করতে থাকবেন। প্রথম সবকে মরণের যে খেয়াল করা হয়েছে, সেই সমস্ত খেয়াল করে খুব গভীরভাবে মনকে বুঝাবেন যে, মন এখন চিন্তা করে দেখ, তুমি বাড়ীর উঠানে নেমে উত্তর শিয়র হয়ে আছ, এখন তোমাকে গোসল দেয়া হয়, কে কে গোসল দেয় খেয়াল করবেন, এখন তোমাকে কাফন পরিয়ে জানাজা দিয়ে দুয়ারে শুইয়ে রাখা হয়েছে, তোমার বিবি এখন সাদা কাপড় পরে বিধবা বেশে নাকের সোনা, হাতের চুঁড়ি খুলে তোমার ধারে দাঁড়িয়ে কাঁদে আর বলে, আমায় তুমি কি দিয়ে গেলে? এখন খেয়াল করেন, আপনাকে কবরের দিকে নিয়ে যায়, আপনার ছেলেমেয়েরা পেছনে দৌঁড়ায় আর 'আব্বা আব্বা' বলে কাঁদে। এরপর খেয়াল করবেন, আপনার মরণের খাট নিয়ে কবরের এক পাশে রাখা হল। এখন আপনাকে কবরে নামানো হল। এখন আপনার সন্তান আপনাকে কবরে রেখে লাফিয়ে কবরের উপরে উঠল। কিতাবে আছে, সন্তান যখন পিতা-মাতাকে কবরে রেখে উঠে আসতে চায়, তখন ঐ পিতামাতার রুহ্ সন্তানের পায়ে জড়িয়ে ধরে কাঁদে আর বলে, বাবা আমাকে একলা ফেলে যেওনা। এখন আপনার কবরের উপরে মাটি ফেলে চাপা দেয়া হল, সবাই বিদায় হয়ে গেল। এখন মুন্‌কার নাকীর দু'জন ভীষণ দর্শন ফেরেশ্‌তা কবরে হাজির হল, তাদের হাতে গুর্জ্জ। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ফরমায়েছেন, সারা দুনিয়ার জ্বীন এবং মানুষ একত্রে চেষ্টা করলেও একটি গুর্জ্জকে একটুও নড়াতে পারবে না। এখন ফেরেশতা দু'জন গুর্জ্জ উঠিয়ে আপনাকে বসিয়ে আপনার ডান এবং বাম কাঁধের দিকে দাঁড়িয়ে আপনাকে সওয়াল করতে উদ্যত হল, আপনি এখন খেয়াল করবেন যে, তাদের সওয়ালের জবাব দিতে না পারলে, এই অন্ধকার কবরে গুর্জ্জের আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাব। আপনি এখন মনকে বুঝাবেন, মন! এই ভীষণ অন্ধকার কবরে এখন তোমার কে আছে, চিন্তা কর! এখন তোমার আল্লাহ বিনে কোন বান্ধব নেই, এই খেয়ালে আপনি এখন তসবিহ্ হাতে নিয়ে একদমে যতবার পারেন

আল্লাহ্‌কে অত্যন্ত আকুলভাবে ডাকবেন এবং দম বন্ধ করে ঘন ঘন করে বলবেনঃ

আল্লাহ্ আল্লাহ্ আল্লাহ্...............আল্লাহ্ - ২১ দমে ২১ (একুশ) **বার** বলবেন। বলতে বলতে দেখবেন এক দমে কতবার 'আল্লাহ্ আল্লাহ্' বলতে পারেন। দ্বিতীয় দমে প্রথম দমের চেয়ে আরও কিছু 'আল্লাহ্ আল্লাহ্' বাড়িয়ে বলার চেষ্টা করবেন। এইভাবে ২১টা দমে 'আল্লাহ্ আল্লাহ্' বলবেন, বলতে বলতে শব্দ বন্ধ হয়ে যাবে, তবু বলা থামাবেন না। এক দমে 'আল্লাহ্ আল্লাহ্' যত বেশী মাত্রায় বলতে পারবেন, সবকে তত বেশী তাছির পাবেন। দিনে রাতে দমে দমে 'আল্লাহ্ আল্লাহ্'র মাত্রা বাড়িয়ে বলতে থাকবেন এবং এক দমে 'আল্লাহ্ আল্লাহ্' বলতে বলতে এই কাজটি শেষ করতে পারি কিনা, বা এই গাছ থেকে ঐ গাছ পর্যন্ত এক দমে 'আল্লাহ্ আল্লাহ্' বলে হেটে যেতে পারি কি না, খেয়াল করবেন সবকের সময় এমনভাবে আল্লাহ্ বলবেন, যেন মুনকার নাকীর আপনাকে প্রশ্ন করার সময় না পায় এবং 'আল্লাহ্ আল্লাহ্' বলা যেন মুহূর্তের জন্য বন্ধ না হয়, আল্লাহ্‌কে ডাকতে ডাকতে যেন কিয়ামত জারী হয়ে যায়।

উক্ত সবকের তাছির (Result)

* জেকের করতে করতে কোন সময় দেখবেন, ঘুম হতে জাগ্রত হলেও আপনার জিহ্বা আপনার অনিচ্ছা সত্ত্বেও একা একা নড়াচড়া করে আল্লাহ্‌র জিকিরে রত আছে।
* খেয়াল করলে আল্লাহ্‌র সকল সৃষ্ট বস্তু থেকে আল্লাহ্ জিকির স্পষ্ট শুনতে পাবেন। বিবিকে খাছ পর্দা করে এবং সুন্নতি লেবাস নিয়ে এই জিকির বেশী মাত্রায় করলে, দেহের ছত্রিশ কোটি পশমের গোড়া দিয়ে আল্লাহ্‌র জিকির বের হতে থাকবে, আখেরাত এবং কবরের অন্ধকারের কথা প্রাণে সদা জাগ্রত থাকবে। এই সবকে ভেতরের হালাত কোন কোন সময় এরকম হবে, দেখবেন, নাভী হতে দেহের উপরের অংশ কোটি কোটি মাইল উর্ধ্বদেশে উঠে গিয়েছে। নাভীর নিচের অংশটুকু জমিনে পড়ে আছে। আরও অন্যান্য হালত হবে, যেগুলো বর্ণনা করা নিষেধ।

এ সবকগুলোর পরে আরও **সতেরটি সবক** রয়েছে। যেগুলো করলে মানুষের কি যে হালত হয় এবং আল্লাহ্‌র সঙ্গে যে কি রকম গভীর সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তা বই পুস্তকে লিখে মোটেই প্রকাশ করা যাবে না।

বিঃ দ্রঃ সবকের অধ্যায়ে যে সবক লিখা হয়েছে, তা থেকে প্রথম সবক করার এযাযত দিলাম। এই সবক করতে করতে যদি কারো চোখে পানি আসে এবং দিল পরিবর্তন হয়, তাহলে এ গোলামের গরীবালয়ে যোগাযোগ করে এলমে মা'রেফতের উপরের নেয়ামতের সবক নেবেন।

- **মানিকগঞ্জ দরবার শরীফে প্রতি বাংলা মাসের শেষ বৃহস্পতিবার মাসিক মাহ্‌ফিল অনুষ্ঠিত হয় ও এল্‌মে মা'রেফতের শিক্ষা দেয়া হয়।**
- **বছরে দু'বার এলমে মা'রেফতের ইসলামী মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ৫, ৬, ৭ অগ্রহায়ণ ও ১০, ১১, ১২ই ফাল্গুন। (প্রয়োজনে তারিখ পরিবর্তন করা হয়)।**

- **প্রতি ইংরেজী মাসের ৩ ও ৪ তারিখে সিদ্দিকীয়া উত্তর বাড্ডা খান্‌কা শরীফে ইসলামী মাসিক মাহ্‌ফিল অনুষ্ঠিত হয়।**

কুতুব-উল-আকতাব অধ্যাপক (অবঃ) আলহাজ্জ্ব হযরত মাওলানা
মুহাম্মদ আয্‌হারুল ইসলাম সিদ্দিকী সাহেব (রহঃ)
এর বড় সাহেবজাদা ও প্রধান খলিফা হযরত মাওলানা
ড. মুহাম্মদ মনযুরুল ইসলাম সিদ্দিকী
পীর সাহেব, মানিকগঞ্জ দরবার শরীফ
প্রিন্সিপাল, জামি'আ-আরাবিয়া সিদ্দিকীয়া দারুল উলুম মাদ্রাসা
চেয়ারম্যান, সিদ্দিকীয়া ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

মানিকগঞ্জ দরবার শরীফে যাওয়ার রাস্তা
ঢাকা আরিচা রোডে মানিকগঞ্জ বাস স্ট্যান্ডে নেমে রিকশায় সিদ্দিক নগর।
ফোন ঃ ০৬৫১ - ৬১৩৪৮

সিদ্দিকীয়া উত্তর বাড্ডা খানকা শরীফে যাওয়ার রাস্তা
স্বাধীনতা স্মরণী সড়ক, উত্তর বাড্ডা, বাড্ডা, ঢাকা। ফোন ঃ ৮৮২ ৭৩৩২
(উত্তর বাড্ডার মেইন রোডের পার্শ্বে হোসেন মার্কেট থেকে বামে স্বাধীনতা স্মরণী রোডের মাঝামাঝি । উপশম হাসপাতালের বিপরীতে)

দু'টি কথা

ধর্মের মূল হচ্ছে বিশ্বাস। ইসলাম ধর্মে কয়েকটি বিশ্বাস না থাকলে তাকে ঈমানদার বলা যাবে না এবং সে কাফের হবে। যেমন কবর আযাব কেউ বিশ্বাস না করলে সে কাফের হবে এবং আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রাসুল (সাঃ) কে বিশ্বাস না করলে তার কোন নেক আমলই কাজে আসবে না। এক শ্রেণীর তথাকথিত শিক্ষিত লোক জাহেলদের মত চিন্তা ভাবনা করে বলে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নবী ছিলেন না, কবি ছিলেন (নাউজুবিল্লাহ্)। কেননা তিনি যে বলেন কবর আযাব সত্য কিন্তু তিনি আরো বলেন কৃপণ ব্যক্তিকে সাপে কিয়ামত পর্যন্ত কামড়াবে যে সাপটির বিষের চোটে চক্ষু নীল হয়ে গেছে এবং মাথার পশমগুলো পড়ে গেছে। একটা লোকের মৃত্যুর পর হাড়গুলো মাটিতে মিশে যায়। ঐ লোকটার বুকটা কোথায় থাকে, সাপটাইবা কোথায় দংশন করে। এ ছাড়া হিন্দুরা পুড়িয়ে একেবারে ছাই করে দেয়। এই ধরণের মন্তব্য নাস্তিকেরা ও তথাকথিত জ্ঞানান্ধরা করে থাকে। এই সমস্ত ভ্রান্ত যুক্তির সদুত্তর নিখাঁদ বিজ্ঞান ও দর্শনের যুক্তি দিয়ে একটি বই লিখে দিয়েছি। তার নাম "মহাস্বপ্ন"।

-ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ-

বাংলাদেশ (Bangladesh)

সিদ্দিকীয়া ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রধান কার্যালয়
সিদ্দিক নগর, মানিকগঞ্জ দরবার শরীফ
ফোন ঃ ০৬৫১-৬১৩৪৮
E-mail: sfbd786@mailblocks.com
ঢাকা কার্যালয়
সিদ্দিকীয়া উত্তর বাড্ডা খান্‌কা শরীফ
স্বাধীনতা স্বরণী সড়ক, সিদ্দিকনগর, বাড্ডা, ঢাকা
ফোনঃ ৮৮২৭৩৩২

জামি'আ আরাবিয়া সিদ্দিকীয়া দারুল উলুম মাদ্রাসা
সিদ্দিক নগর, মানিকগঞ্জ দরবার শরীফ
ফোন ঃ ০৬৫১-৬১৩৪৮

মডার্ন বুক সেন্টার
১, মিরপুর রোড (ইসলামিয়া মার্কেট)
নীলক্ষেত, ঢাকা। ফোনঃ ৮৬১৯৭৯০

সোনিয়া মেডিকেল বুক হাউজ
২৪, মিরপুর রোড, (ইসলামী মার্কেট)
নীলক্ষেত, ঢাকা। ফোনঃ ০২-৮০১৪৩৫

কুষ্টিয়া সীড স্টোর লাইব্রেরী
(মিরপুর ১১ নং বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন) ঢাকা
ফোনঃ ৮০১১৪৩৫

ভূঁইয়া কনফেকশনারী
পূরবী সুপার মার্কেট, মিরপুর, পল্লবী, ঢাকা
ফোনঃ ০১৭১-১৪৮৫০৮

উজ্জ্বল বই বিতান
৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা, ফোনঃ ৭১২ ৩৬০৪

অফিস ইন্টারলিংক
২৭১/১ পশ্চিম নাখালপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা
ফোনঃ ৮১২ ০০১৭, ৮১৫ ০১৭০

আবদুল্লাহ্‌
জেনেসিস প্রাঃ লিঃ
৭৩, সিদ্ধেশ্বরী রোড, রমনা, ঢাকা
ফোনঃ ০১৮-৪৯৩৬৩৭
E-mail: genesisl@bdcom.com

INDIA (ভারত)

Techno World
(Exclusive Distributor in India)
Block B, Shop 54, College Street Corpn. Market,
Kolkata-700 007 (Beside Bibhuti Hotel)
Tel: 91-33- 2219-6116
E-mail: technoworld786@vsnl.net

UBS Publishers' Distributors Pvt. Ltd.
8/1-B, Chowringhee Lane, Kolkata-700 016
Tel: 91-33-22521821, 22522910,
Fax: 91-33-22523027
E-mail: ubspdcal@cal.vsnl.net.in

National Book Store
15, Bankim Chattojee Street, Kolkata-700 073
(Opposite of Kolkata Presidency College)

Sarvodaya Book Stall
Howrah Station
(Old Complex, Near Main Enquiry)
Howrah-711101 (W.B)

Biswas Book Stall
88 U. G. Road, Kolkata-700 009

International Book Trust
54 College Street, Kolkata-700 073

M/s. Preface Books
Mumbai, India

UBSPD
New Delhi & Bangalore

ITALY (ইটালী)

Rashid Communications
VIA Goito, 7/a, 40126 Bologna
Italy, Tel: 051-273021

Carto Livreria
VIA - La- Marmora - 16
0085 Roma
ITALY, Tel: 06-441133

লেখকের গ্রন্থসমূহ

❒ **মহাভাবনা** (MOHA VABNA) **(স্বর্ণপদক প্রাপ্ত)**
এ মহাকিতাবে সমগ্র বিশ্বে এই প্রথম মহান আল্লাহ্‌পাকের অস্তিত্ব সম্পর্কে বিশ্ব চ্যালেঞ্জ (The World Challenge) করা হয়েছে, যা বিশ্বের নাস্তিকরদের মাথা নিচু করে দিচ্ছে । কোরআন শরীফ, হাদিস শরীফ ও বিজ্ঞানের আলোকে আল্লাহ্‌পাকের বিশালতা সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করা হয়েছে এবং যুক্তি দিয়ে দেখানো হয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌পাকের এবাদত করে না সে নিকৃষ্ট প্রাণীর চেয়েও অধম। যুগশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান ভিত্তিক ধর্মীয় এ মহা কিতাবে মহা সৃষ্টি সম্পর্কে তিনি জ্যোতিশাস্ত্র (Astronomy), দর্শণ (Philosophy), দেহবিজ্ঞান (Physiology), পদার্থবিদ্যা (Physics), রসায়ন (Chemistry), গণিত (Mathematics), ইত্যাদির আলোকে আলোচনা করেছেন। এতে জ্ঞান পিপাসু মানুষের জ্ঞানের সন্ধান রয়েছে।

❒ **মহাস্বপ্ন** (MOHA SHAPNA)
হুজুরপাক (সাঃ) এর পর থেকে প্রায় **১৫**শত বছর পর তাঁর একটি সহি হাদিস শরীফের সঠিক বৈজ্ঞানিক প্রমানের মাধ্যমে **১৯৮৬** সালে নতুন একটি থিওরী (Man will have never been vanishing and one man divided into core of cores **atom-men** after death and they can listen and watch with live feelings) আবিষ্কার করেছেন যা বিজ্ঞানের মতধরাকে পরিবর্তন করবে। মৃত্যুর পর হিন্দুরা পুড়িয়ে, মুসলমান ও খৃষ্টানরা মাটিতে গলিয়ে দিলেও কিভাবে কৃপন ব্যক্তির বুকে সাপে কামড়ায় তার প্রমাণ করা হয়েছে।

❒ **জীবন রহস্য ও দেহতত্ত্ব** (JIBON RAHASHA DEHA TATTA)
জীব-বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে ও দর্শনের যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন মহান আল্লাহ্‌পাক মানব দেহের ভিতরের নানা জটিল কার্য কিভাবে অনবরত সমাধান করছেন এবং দেহটাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। মেডিক্যাল সাইন্সের জিস্ট (নির্যাস) বের করে কোরআন শরীফের আলোকে এ কিতাবখানি লেখা হয়েছে। মানব দেহের কোথায় আল্লাহ্‌পাক থাকেন তার সঠিক প্রমাণ করা হয়েছে। অনেক নাস্তিক এ কিতাব পড়ে আল্লাহ্‌পাকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে বাধ্য হয়েছে।

❒ **বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পর্দা** (BIGGANER DRISTITAY PARDA)
বেপর্দা নারীর স্বামীর কি যে সর্বনাশ হয় এবং সে কিভাবে যে অতিসত্বর পুরুষত্বহীন হয়ে পড়ে তা বিজ্ঞান এবং ডাক্তারী শাস্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। অসংখ্য নর-নারী বেপর্দা ও বিষাক্ত জীবন থেকে ফিরে এসে পর্দার মাধ্যমে শান্তিময় ইসলামী জীবন বেছে নিয়েছেন। এমনকি অনেক হিন্দু ও খৃষ্টান মহিলারা পর্যন্ত বোরখা পরে পর্দা করা শুরু করেছেন।

❒ **ধূম পিপাসা সর্বনাশা** (DHUM PIPASA SHARBANASHA)
ধূমপান করলে কি সর্বনাশ হয়, ডাক্তারী শাস্ত্রে তা দেখানো হয়েছে। ধুমপান করলে যে ক্ষতি হয়, তা নষ্ট করার কায়দা দেখানো হয়েছে এবং কি উপায়ে ধূমপান করলে ক্ষতি হয় না এবং ধূমপান কিভাবে ত্যাগ করা যায়, তার একটি অব্যর্থ উপায় লিখে দেয়া হয়েছে। এটা বহু পরীক্ষিত।

❒ **পীর ধরার অকাট্য দলিল** (PEER DHARAR AKATTA DALIL)
অনেকে বলে, পীর ধরার দরকার নেই। এসব কথার সদুত্তর কুর'আন শরীফ থেকে অকাট্য দলিল দিয়ে প্রমাণ করা হয়েছে যে, পীর না ধরলে মানুষ আল্লাহ্‌কে চিনতে পারবে না এবং মা'রেফতের জ্ঞান লাভ করতে পারবে না, অবশ্য আল্লাহ্ পাক ইচ্ছে করলে সবই পারেন। পৃথিবীর যুগশ্রেষ্ঠ সমস্ত আল্লাহ্‌র ওলীগণ সবাই যে পীর ধরেই মহামনীষী হয়েছেন, সে সম্পর্কে সঠিক আলোচনা করা হয়েছে।

❒ **তারানায়ে জান্নাত** (TARANA- A- JANNAT)
বিচ্ছেদ বেদনাতুর হয়ে ঝংকৃত, কাব্যিক রসে স্নাত, ছন্দের দ্যোতনায় আপ্লুত অতি উচ্চ পর্যায়ের আধ্যাত্মিক গজলের কিতাব যা সালেককে আল্লাহ্‌পাকের খুব নিকটে পৌঁছায়। মা'রেফত পন্থীদের জন্য এলমে মা'রেফতের উচ্চাঙ্গের তত্ত্ব এই বইটিতে গজল আকারে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

❒ **মা'রেফতের ভেদতত্ত্ব** (MAREFATER VEDTATTA)
মা'রেফতপন্থীদের জন্য এলমে মা'রেফতের উচ্চাঙ্গের তত্ত্বসম্বলিত ও চিশতিয়া সাবেরিয়া তরিকার সবকসমূহ এবং সাজরানামা সম্বলিত কিতাব। এটি সালেকদের পাঠ্য বই।